বীজ ও মহাসৃষ্টি

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী
মহারাজের একান্ত - ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা সংকলন

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র-

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ মহালয়া, ১৪১২
৩রা অক্টোবর, ২০০৫

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

বীজ ও মহাসৃষ্টি

মুখবন্ধ

একটি বীজ পুঁতলে যেমন সেটি আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হয়ে অসংখ্য ডালপালা মেলে, ফুল ফল হয়ে আরও হাজার হাজার বীজের সৃষ্টি করে, তেমনি গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র (তেজমন্ত্র) দেহক্ষেত্রে বপন করলে কি তা আস্তে আস্তে স্ফূরিত হয়ে সহস্র সহস্র তেজের (সূর্যের) ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়া সম্ভব?

সব বিষয়বস্তুই তেজেরই এক রূপ। সবটাই তেজ। তেজ হতেই জগৎ সৃষ্টি। মন্ত্রতন্ত্র সবটাই তেজ। এই তেজ অর্থাৎ সূর্যকে ধ্যান করলে, ধ্যানের তন্ময়তায় গভীরতায় সূর্যের যে বীজ, তার যে বীর্য, তা কি সকলের ভিতর আস্তে আস্তে ব্লুজম (Bloosom) হওয়া বা প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? গ্ল্যান্ডে এই বীজ বপন করা হলে, তা অঙ্কুরিত বা বিকশিত হয়ে সহস্রারে সহস্র সূর্যের শক্তির প্রকাশ কি করতে পারে?

আম গাছ থেকে আমই হয়। কাঁঠাল গাছের বীজ পুঁতলে কাঁঠাল গাছই বের হয়। জন্মসিদ্ধ মহানের দেওয়া বীজমন্ত্র দেহক্ষেত্রে বপন করলে, তা কি ফলতে বাধ্য? আধ্যাত্মিক জগতে যাঁরা ধরাধামে এসে সাধন ভজন ক'রে, কঠোর কৃচ্ছসাধন ক'রে মহান হয়েছেন, তাঁদের দেওয়া বীজমন্ত্রের ক্ষমতা কতটুকু? আর যিনি পূর্ণ হয়েই আসেন, এই ধরাধানে এসে নতুন করে সাধন, ভজন তাঁকে কিছু করতে হয় না। অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি মহান হয়েই আসেন; এই বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন; জীবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার গুরুভার যিনি বহন করতে পারেন; যিনি গতিদাতা হয়ে জন্মের সাথে সাথে গতির পথ দেখাতে শুরু করেন; তাঁর দেওয়া বীজমন্ত্রের কার্যকারিতাই বা কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, "আমি জন্ম থেকেই বিশ্বের সুর নিয়ে এসেছি। যে জ্যোতি, যে আলো, যে চিন্তাধারা হতে আমি এসেছি, সব ভক্তশিষ্যকে যাতে সেখানে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। যার দিকে তাকাই দেখি, এখনও ২০ হাজার জন্ম। এই ৭০/৮০ বছরের আয়ুর মধ্যে কিভাবে সেটা কাটানো (শেষ করে দেওয়া) সম্ভব? তখন চিন্তা করলাম, আমার পথ করতে হবে ইঞ্জিন আর বগির মতো। সামান্য জিনিস দিতে আমি আসিনি। বিশ্বের সেই আদিশক্তি, যখন কিছুই ছিল না, সেই আদিতম বীজশক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই তোমাদের ঠাকুর এখানে এসেছেন। সেই বীজই তোমাদের দান করা হয়েছ। সেই মন্ত্রই একদিন তোমাদের ভিতর জেগে উঠবে।"

বীজমন্ত্র কি শয়নে স্বপনে জাগরণে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, মনের চঞ্চল অবস্থায় জপ করা যায়? জপ কি সর্বগুণবিশিষ্ট, সর্বদর্শী সর্বব্যাপ্তমান? সর্বশক্তির সমন্বয়ে যে শক্তি, সেটাই কি বীজমন্ত্র বা জপ? শব্দই ব্রহ্ম, বিরাট চিন্তার সমন্বয় যদি একটি শব্দে হয়, তবে কি মূলমন্ত্রের মূলশব্দের জপে আমাদের দেহবীণাযন্ত্রের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, প্রতিটি অণু পরমাণু ধ্বনি হয়ে বেজে উঠবে? দেহবাণীযন্ত্রের তারগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে হুঙ্কার শব্দে বেজে উঠবে? যদি বেজে ওঠে, তবে কি সেই সুর অজানাকে জানিয়ে দেবে? অদেখাকে দেখিয়ে দেবে? না অদৃশ্যকে দৃশ্যে আনতে পারবে?

ধ্যান করলে কি মূর্তির দর্শন হবে? ধ্যানের মধ্যে মূর্তি কি সাধকের ডাক শুনবে? ডাক কি আদৌ শোনা যায়? যদি না শোনা যায়, তবে তো দ্বন্দ্ব থেকেই গেল। এটা আবার সত্য যে, দর্শন যদি না হয়, তখন তো যার যার কর্মফলকে দায়ী করা হয়। সাধারণতঃ আমরা যেই মন নিয়ে একাগ্রচিত্তে কোন চিন্তায় বা ধ্যানে বসি, সেটা ভক্তিমূলক আর জ্ঞানমূলক যাই হোক না কেন, এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ধ্যানের মধ্যে মূর্ত্তির দর্শন বা আগমন, তার কি আদৌ কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে? শাস্ত্রে পুঁথিতে, খাতায় পাতায় অনেক কিছু লেখা থাকে, এইসবের উপর কি নির্ভর করা যায়? যদি না যায়, তবে প্রত্যক্ষভাবে জানা দরকার নয় কি?

এই বীজমন্ত্র ফুটাবার জন্য এক একজনের কমপক্ষে কত জপ জমা দেওয়া দরকার? জপের খালি পাত্র পূর্ণ না হলে কি কোন উপলব্ধি করা যাবে না? পাত্র যে পূর্ণ হয়নি, তা বুঝবার উপায় কি মনের বিক্ষিপ্ততা চঞ্চলতা?

কি ভাবে জপ করতে হবে? শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''একটু বসে গভীরভাবে চিন্তা করবে; মনে যে কোন চিন্তা আসুক, ক্ষতি নাই। জপের ধ্বনি লক্ষ লক্ষ সুর টেনে আনবে। ঐ ধ্বনি বেশী স্মরণ করলে দেখবে, একটা আমেজ এসে পড়েছে। একদিন দেখবে বহু ভাসমান শব্দ যেন তোমাকে guide করে নিয়ে যাচ্ছে। ফুটতে শুরু করলে দূর থেকেই ঠাকুরকে দেখতে পাবে। দেখবে, ঠাকুর এসে প্রেরণা যোগাচ্ছেন; সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করছেন। অতি সহজভাবেই উপলব্ধি করতে পারবে।''

সৃষ্টির আদিতে একবারেই মানুষের সৃষ্টি হয়নি। আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনের ধারায় ধারায় সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে রূপের পর রূপ পরিবর্ত্তিত হতে হতে মানুষের রূপ ধারণ করেছে। এটাই আমাদের প্রথম জীবন নয়। অগণিত জীবন ধারণ করার পরে এই পৃথিবীতে এসেছি। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সেই জীবনকে তাচ্ছিল্য অবহেলা করছি। মহাবিশ্বের মহাদান এই যে আমরা অবহেলা করছি, এরজন্য কি পরে আমাদের আফশোস করতে হবে? তবে এর থেকে মুক্তি পাবার উপায়? মুক্তির উপায় কি শুধু বেদের ধ্বনি স্মরণ? বেদের ধ্বনি শ্রবণ? এতেই কি জীবের একমাত্র মঙ্গল? একমাত্র কল্যাণ?

গুরুর দেওয়া পাথেয় সম্বল করে আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারে সুর বেঁধে নিয়ে মহাশূন্যের ধ্যান করলে কি অনন্ত মহাকাশের অজস্র অগণিত জীবকণার (আত্মার) সাথে সাক্ষাৎ হবে? তাদের কি চেতন আছে? চৈতন্য আছে? তারাও কি একদিন আমাদের মত এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল? এখানকার সুখ, আনন্দ, স্ফূর্তি, আমোদ প্রমোদের মধ্যে আত্মাহারা হয়েছিল? আর সেই আত্মহারার হারাতে ডুবে থাকার জন্য, জীবন মৃত্যুর ঘূর্ণিপাক থেকে রেহাই পাবার জন্যই কি চিৎকার করে বলছে রক্ষা কর? রক্ষা কর? কে কাকে রক্ষা করবে? কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে? না, আপন আপন গতির সাথে গতি মিলিয়ে চললেই রক্ষা পাওয়া যায়?

দেহ থেকে যখন আত্মা (মৃত্যুর পর) বেরিয়ে যায়, তারপর কি আত্মা বুঝতে পারে যে, দেহে থাকা অবস্থায় সে কি আকাম কুকাম করেছে? যদি বুঝতে পারে, তবে নিজেকে শোধরাবার জন্য সে কি আবার দেহে প্রবেশ করার চেষ্টা করে? সেই চেষ্টা কি সার্থক হয়? যদি না হয়, তবে তার পরবর্ত্তী অধ্যায় নির্ণয় হবে কি এখানকার (পৃথিবীর) সাধনা ও জপের মাত্রার উপর? তবে কি জীবন থাকতেই সবার নিজ নিজ তল্পি গুছাতে হবে? এখানকার পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কি গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র জপ করা, আর গুরুর আদেশ নির্দেশ পালন করা?

এই সকল বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানকল্পে চলুন আমরা যাই, জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অমূল্য তত্ত্বকে পাথেয় করে মহাকাশের মহাশূন্যের বীজ ও মহাসৃষ্টির উৎস সন্ধানে।

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব পাণ্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত যা চলার পথের পাথেয়রূপে মানুষকে পথ প্রদর্শন করবে) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরু দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন **"অভিনব দর্শন"**।

"অভিনব দর্শন" প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদস্বরূপ তিনি তাঁর 'বাহন'টি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে সপ্তম শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল **বীজ ও মহাসৃষ্টি**।

পরিশেষেএই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **'রাম নারায়ণ রাম'**।

শুভ মহালয়া, ১৪১২ *চপল মিত্র*
৩রা অক্টোবর, ২০০৫ *(প্রকাশক)*

-ঃ বীজ ও মহাসৃষ্টি ঃ-

বিশেষ দ্রষ্টব্য

- পরম পিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রুতিলিখনে এবং টেপ-রেকর্ড থেকে সংকলনে, তিনি যখন যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, হুবহু সেটাই রেখে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কখনও তিনি একই বাক্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠিক সেইভাবেই তাঁর বাণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোল।

- পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুনরুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শ্রীশ্রী ঠাকুর তত্ত্বের গভীরতা মনে গেঁথে দেবার জন্য পুনরুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মা অসীম ধৈর্যসহকারে তাঁর সন্তানকে কোন কিছু শেখানোর জন্য বারবার করে সেই কথাটি সন্তানের কাছে বলতে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি তার মনে গেঁথে না যায়, মায়ের চেষ্টার অন্ত থাকে না। সন্তান শিখে নিলে মায়ের মুখে দেখা যায় পরিতৃপ্তির হাসি। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের কাছে। প্রকৃতির গভীর তত্ত্বের খনি থেকে মণি আহরণ করে একটি একটি করে তুলে ধরছেন আমাদের সামনে। অনাদি অনন্ত প্রকৃতি মায়ের কাছে আমরা সবাই নিতান্তই অবোধ শিশু। প্রকৃতির এই তত্ত্বের ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী। আমাদের মনে তত্ত্বের সুর, তত্ত্বের গভীরতা, এই অনন্ত জ্ঞানরাশি একটু একটু করে গেঁথে দেবার জন্য পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর একই কথা বারবার করে বলেছেন। একই বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি করেছেন।

মনুষ্য জীবনই প্রথম জীবন নয়

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৭
(২৯-০৫-১৯৮৪)

আজ অন্যভাবে ক্লাস করি। একটু চক্ষু বুঁজে আজ্ঞাচক্র চিন্তা কর আর মনে মনে জপ কর। আমি জপের কিছু ব্যাখ্যা এবং আকাশপথে কিভাবে গমনাগমন হয়, কিভাবে আকাশপথে যায়, সে বিষয়ে কিছু বলছি। তোমরা চক্ষু বুঁজে ধীরস্থির হয়ে বসো আর মনে মনে জপ কর। জপের সময় কিভাব হওয়া উচিত এবং গতির পথ কিভাবে সহজ হয়, তার একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি। তোমরা বেশ টান হয়ে ধীর হয়ে বসো আর মনে মনে ভাব, পৃথিবী যেমন শূন্যের উপর আছে এবং প্রচন্ড বেগে ঘুরছে, তোমরাও সব শূন্যের পথে, আকাশের পথে আছ। কোনরূপ কোন মূর্ত্তির দরকার নেই, কোন কিছু নাই। কেবল আজ্ঞাচক্রে মন রেখে আকাশ চিন্তা কর। আজ্ঞাচক্রের কথা তোমাদের অনেকবার বলেছি।

তোমরা বেশ টান হয়ে ধীর হয়ে বসো আর মনে মনে ভাব, পৃথিবী যেমন শূন্যের উপর আছে এবং প্রচন্ড বেগে ঘুরছে, তোমরাও সব শূন্যের পথে, আকাশের পথে আছ। কোনরূপ কোন মূর্ত্তির দরকার নেই, কোন কিছু নাই।

মনে কর, এক ঋষি আকাশপথে চলেছেন। তোমাদের সাথে ঐ ঋষির দর্শন হয়েছে। মনে কর, তোমরা উত্তর দিকে যাচ্ছ আর ঋষিও সেই পথে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। সেই ঋষি বেদজ্ঞ। তিনি

মহাশূন্যে সুর দিয়ে চলছেন। পথিক, যাত্রিক যারা শূন্যপথে পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সাহায্য করাই তাঁর কাজ। তিনি তোমাদের কাছে আসবেন, দেখা হবে, এটাই মনে কর। ধ্যান তোমাদের কিরূপ হবে? তোমরা চলছো সেই মহাশূন্যের পথে আপনগতিতে আপনমনে আপনসুরে। শূন্যের কোন দিক্ নেই। উত্তর নেই, দক্ষিণ নেই, এখানকার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উঁচু নেই, নীচু নেই, কোনকিছু নেই। এই জপ তোমাদের একমাত্র সম্বল হয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই পথে। তোমরা সবাই সেই পথের পথিক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছ। একমাত্র নাদধ্বনি যেটা, সেই মহাধ্বনি স্মরণ করে এগিয়ে যাচ্ছ। ঋষি যাঁরা, বেদজ্ঞ যাঁরা, তাঁরাও তোমাদের ধ্বনির আহ্বানে, তোমাদের সাড়ায় এগিয়ে আসছেন।

হে ঋষি, হে বেদজ্ঞ, এই শূন্য পথে একমাত্র সেই সুর রয়েছে। আপন গতিতে আপনা আপনি এই মন্ত্র, এই সুরের অর্থ ভেসে রয়েছে। একদিকে মহাকাশ, আর একদিকে মন্ত্রগুলি ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও সবাই একত্রিত হয়ে শূন্যপথে এগিয়ে যাচ্ছি। শিব এবং বিষ্ণুও একদিন মহাশূন্যের পথে এইভাবে যাত্রা করেছিলেন। এইভাবে জপধ্যান করতে করতে, চিন্তা করতে করতে তাঁরা আপনমনে চলেছেন চলার পথে। এখানে ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনকিছুর প্রয়োজন নাই। শুধু স্মরণ, শুধু স্মরণ। শুধু নাম, মহানাম তোমরা স্মরণ করতে করতে যাও। এইভাবে নাম করলে পরে দেবতারা জেগে ওঠেন। সেই ধ্বনি ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে সুর বেজে ওঠে, অসুর বৃত্তিগুলো দমন হয়। ভয় নাই। বেদ বলছেন, বেদজ্ঞরা বলছেন, হে মহাশূন্যের পথিক, যাত্রিক ভয় নাই, ভয় নাই। তোমরা নির্ভীক সন্তান। নির্ভাবনায় এগিয়ে চলো। ভয় নাই; নির্ভাবনায় নির্ভীকচিত্তে শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলো সেইপথে। হে পথিকগণ, হে যাত্রিকগণ, আবহমানকাল থেকে এমনি করে সবাই চলে যাচ্ছে। তাদের সান্নিধ্যলাভ হচ্ছে না। তোমরাও একদিন মহাগতির পথে পরমগতি লাভ

বেদ বলছেন, বেদজ্ঞরা বলছেন, হে মহাশূন্যের পথিক, যাত্রিক ভয় নাই, ভয় নাই। তোমরা নির্ভীক সন্তান। নির্ভাবনায় এগিয়ে চলো। ভয় নাই; নির্ভাবনায় নির্ভীকচিত্তে শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলো সেইপথে।

করবে। ভয় নাই। দর্শন, অনুভূতি, নির্বাণ, নির্বিকল্প আসবে, সেই অভিজ্ঞতা আসবে। সর্বচক্র (সপ্তচক্র) জাগবে, সর্ব অনুভূতিতে ভরপুর হযে পরমানন্দ লাভ করবে। তাই সদাসর্বদা আজ্ঞাচক্রে তন্ময় হয়ে থাকবে। এই আজ্ঞাচক্রে ডুব দিলে মহাসাগরের মহাধ্বনি মিলবে। আজ্ঞাচক্রে মনোনিবেশ করে স্মরণ করলে পাবে, সবকিছু পাবে। তাই এখানে কোন জিজ্ঞাসা আসে না, কোন প্রশ্ন হয় না। জীবনের গতি এমনি করে মিশে যায় অনন্ত গতির পথে। তাই বেদজ্ঞরা অনেকে এমনি করে মহাশূন্যের পথে সুরধ্বনি ধ্বনিত করে চলেছেন।

শত শত সহস্র সহস্র পৃথিবীর সব আত্মা শত শত জীবন এমনি করে আকাশে বাতাসে চিৎকার করছে মুক্তির জন্য। চলার পথে কত শত সহস্র জীবের আত্মার সান্নিধ্যলাভ করবে। কত জ্ঞাতি আত্মার সম্মুখীন হবে। তখন ব্যথা হবে, দুঃখ হবে। প্রতিটি জীবনের মূল্য আছে। কেন এই জীবনকে অবহেলা করছো? এই মুক্ত অবস্থায় বিরাজিত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। জীবন যেমন সঠিক, মৃত্যুও তেমনি সঠিক। মুক্তির পথে, অভিজ্ঞতার পথে শত বাধা কেন আসে? যেদিন চলে যাবে এই দেহ অবসানে, দেখবে, আকাশ ভরে আছে ধুলিকণার মত সহস্র জীবকণায়। দেখবে আত্মায় ভরা আকাশ। তখন দেখবে, শত শত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি আত্মা চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে, দুঃখ করছে, আফশোস করছে। এই পৃথিবীর বুকে যেমন কত কোটি কোটি মানুষ, অনন্ত মহাকাশে তেমনি অজস্র অগণিত জীবকণার সহিত সাক্ষাৎ হবে। তাদের চেতন আছে, চৈতন্য আছে। তারা একদিন জন্মগ্রহণ করেছিল এই পৃথিবীতে। এখানে কোথায় সুখ করে তারা আত্মহারা হয়েছিল। তারপর পৃথিবী থেকে যখন চলে যাচ্ছে, সেই আত্মহারার হারাতে ডুবে থাকার জন্য, ঘূর্ণীপাকের থেকে রেহাই পাবার জন্য চিৎকার করে বলছে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।' কে কাকে রক্ষা করবে? কেউ কাউকে রক্ষা করে না। আপনাআপনি গতির সাথে গতি মিলিয়ে চললেই রক্ষা পাওয়া যায়।

শত শত সহস্র সহস্র পৃথিবীর সব আত্মা শত শত জীবন এমনি করে আকাশে বাতাসে চিৎকার করছে মুক্তির জন্য।

ভুলে যেও না, এটাই প্রথম জীবন নয়। অগণিত জীবনধারণ করার পর এই পৃথিবীতে এসেছো। তাই যে সম্বল দিয়েছি, যে পাথেয় দিয়েছি, সেই সম্বল নিয়ে আজ্ঞাচক্রে মনকে বাঁধ। সহস্রারে সুর বেঁধে নাও। আজ্ঞাচক্রে অনন্ত মহাশূন্যের ধ্যান কর। যেভাবে দেবর্ষি নারদ সুর বেঁধেছিলেন এই আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে। আকাশের পথের পথিক হয়ে, মহাশূন্যের যাত্রিক হযে শুধু স্মরণ করে যাও, সেই সুরধ্বনিতে ধ্বনিত কর তোমার চলার পথ। তোমাদের যাত্রাপথ সুগম কর। দেবর্ষি নারদ এমনি করে বাজিয়েছিলেন আজ্ঞাচক্রে, বাজিয়েছিলেন সহস্রারে, বাজিয়েছিলে অনাহতে, মণিপুরে। তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে একদিন সমস্ত জীবকণারা, আত্মকণারা (আত্মারা)। তোমাদের সামনে নিয়ে বসাবে। বসিয়ে তারা বলবে, 'বলো, বলো। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সেই জীবনকে অবহেলায় তাচ্ছিল্য করে এসেছি। ভগবানের দান, ভগবান প্রদত্ত সে জীবন, সেই মহামূল্য জীবন ফেলে দিয়ে এসেছি। সেই জীবন সাধারণের সহিত সাধারণভাবে মিশে মিশে শেষ করে আজ বাতাসে বাতাসে আকাশে আকাশে ঘুরছি। প্রতীক্ষা করছি, আবার কবে আমাদের জন্ম হবে, তারই জন্য প্রতীক্ষ করছি। যেন আমাদের জন্ম হয়। কুকুরই হই, শিয়ালই হই আর কীটপতঙ্গই হই, যেন জন্মলাভ করতে পারি। এইভাবে আর পারছি না। এইভাবে আকাশে, মহাশূন্যে কোটি কোটি বছর এমনি করে নিরাশ্রয়ে জর্জরিত হয়ে, আকাশের পথে, মুক্তির পথে কন্টক হয়ে বসে আছি। সূর্যের দিকে তাকাই, আকাশের দিকে তাকাই, পৃথিবীর দিকে তাকাই আর আফশোস করি। পৃথিবীর মুখ দেখছি আর ভাবছি, এই ভুল যা করেছি, সেতো সীমাহীন। আরও যারা সবাই চলে আসছে, তারাও তো এই ভুল করলো, কেন করলো?

ভুলে যেও না, এটাই প্রথম জীবন নয়। অগণিত জীবনধারণ করার পর এই পৃথিবীতে এসেছো। তাই যে সম্বল দিয়েছি, যে পাথেয় দিয়েছি, সেই সম্বল নিয়ে আজ্ঞাচক্রে মনকে বাঁধ। সহস্রারে সুর বেঁধে নাও। আজ্ঞাচক্রে অনন্ত মহাশূন্যের ধ্যান কর।

জীব জগৎকে সম্বোধন করে বেদ বলছেন সবাইকে, হে জীবগণ, এই ভুল তোমরা করো না। কারণ শিশু বয়স থেকে এই বয়স পর্যন্ত চিন্তা

বেদ বলেছে, যখন চলে যাবে এই পৃথিবী ছেড়ে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, অগণিত আত্মা তোমারই মতো এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে এই মহাকাশে বিরাজ করছে ঘুরে ঘুরে; তখন দুঃখ আসবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।

করে দেখ, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ চুল পেকে যাচ্ছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে, চোখে দেখার বাধা হয়ে আসছে। দিন শেষ হয়ে আসছে। সময় যে আর নেই। কাজেই এই ভুল কোর না পথিক। বেদ বলেছে, যখন চলে যাবে এই পৃথিবী ছেড়ে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, অগণিত আত্মা তোমারই মতো এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে এই মহাকাশে বিরাজ করছে ঘুরে ঘুরে; তখন দুঃখ আসবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তাদের মূখ দিয়ে তখন বেদের কথা শুনবে। তারা তখন বলবে, জগৎবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলবে, বেদ যেভাবে মুক্তির পথ সহজ করে দিয়েছিল, আমরা তা শুনিনি। আমরা যেভাবে ভুল করেছি, তোমরা যেন সেভাবে ভুল কোর না। দিন চলে যাচ্ছে। দিন চলে যাচ্ছে। সময় যে আর নেই। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। শুধু এইভাবে স্মরণ করে যাবে। আর যখন উচ্চৈস্বরে বলবে, তখন শুধু এইভাবেই বলবে, মহানাম উচ্চারণ করবে। সেই ধ্বনি কতদূর ধ্বনিত হবে। তা নিয়ে যতদূর যাওয়া যায়, সেও কত মধুময়। কত শান্তি, কত বড় বিজ্ঞান যে এর মধ্যে রয়েছে। আকাশের মত জীবনের ধারা মিলে যাবে। সব গ্রহ-নক্ষত্র, অমাবস্যা পূর্ণিমা সব কিছুর সঙ্গে মিলে যাবে। আমাদের জীবনের ছক কষে কষে আমরা সেইভাবে এগিয়ে যাব। শুধু বেদের ধ্বনি স্মরণ কর; বেদের ধ্বনি স্মরণ কর। এতেই জীবের একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র কল্যাণ। বেদধ্বনি শ্রবণ কর। বেদশব্দের অর্থ অমূল্য; বেদশব্দ মেঘের গর্জনের মতো। বেদের শব্দ যখন কর্ণে প্রবেশ করবে, দেহের মাঝে আপন মনে আপন গতির সাথে মিশে গিয়ে পথ পরিষ্কার হবে, সহজগতি হবে, অনুভব, অনুভূতি, দর্শন সবকিছু হবে। সবকিছুর সমাধানের ভিতর দিয়ে তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হবে। তাই বেদের ধ্বনি মঙ্গলময়।

বেদের ধ্বনি স্মরণ কর। এতেই জীবের একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র কল্যাণ। বেদধ্বনি শ্রবণ কর। বেদশব্দের অর্থ অমূল্য, বেদশব্দ মেঘের গর্জনের মতো, বেদের শব্দ যখন কর্ণের প্রবেশ করবে, দেহের মাঝে আপন মনে আপন গতির সাথে মিশে গিয়ে পথ পরিষ্কার হবে, সহজগতি হবে, অনুভব, অনুভূতি, দর্শন সবকিছু হবে।

শিব করলেন বেদ ধ্বনি। শিব বললেন বেদের বাণী। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে শিব সেই মহাবাণী পাঠ করলেন। তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে শিবের বাণী শুনবার জন্য। ত্রিশূলহস্তে শিব তখন বললেন, হে জীবজগৎ, হে জগতের জীবগণ, হে পথিক, শুধু আমার কথাগুলি শোন। অর্থ বোঝ না বোঝ, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যা বলে যাচ্ছি, সেই ধ্বনি শুধু কর্ণে প্রবেশ করাও। আপনি একদিন সেই শব্দধ্বনি অর্থের সাথে মিশে তোমাকে নিয়ে যাবে অনন্তের পথে। তোমার সঙ্গে বেদধ্বনির অর্থ মিলেমিশে একধ্বনি হয়ে যাবে। কঠিন লৌহকে উত্তাপে গলিয়ে তরল করা হয়। এই দেহমন আপনি একদিন গলিত হয়ে তরল হয়ে যাবে। আপনি একদিন এই আকাশের সঙ্গে এক আত্মা হয়ে যাবে। আকাশের সাথে মিশে আপনি আকাশ হয়ে যাবে। শিব বলছেন, আমি আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে উপবেশন করে বেদধ্বনি করছি। যখন আকাশের পথে মনে মনে সূর্যচন্দ্রকে সাথে নিয়ে, অগণিত গ্রহ-উপগ্রহকে সাথে নিয়ে চলতে থাকি, দেখতে পাই, তারাও তোমাদের মত সাধনা করছে। তারাও মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে। তারাও মুক্তির জন্য ব্যস্ত। তাই জীবন নিয়ে যখন এসেছ, হে পথিক, মনকে শুধু বলো, সেই চেতনকে নিয়ে, মহাচৈতন্যকে নিয়ে স্ব-চেতনকে যেন জাগাতে পার। দেখবে, কত মধুর, কত সুন্দর জিনিস ফুটে বের হবে। প্রত্যেকটির মধ্যে অঙ্ক রয়েছে, প্রত্যেকটির মধ্যে শাস্ত্র রয়েছে। প্রত্যেকটির মধ্যে বিজ্ঞান রয়েছে। বেদ শুধু বলছে, মিশে যাও।

জীবন নিয়ে যখন এসেছ, হে পথিক, মনকে শুধু বলো। সেই চেতনকে নিয়ে, মহাচৈতন্যকে নিয়ে স্ব-চেতনকে যেন জাগাতে পার। দেখবে, কত মধুর, কত সুন্দর জিনিস ফুটে বের হবে।

প্রঃ- বাবা, মিশে যাব কেমন করে? 'মিশে যাও' বললেই তো মিশে যাওয়া যায় না?

উঃ- মিশে যাবার জন্য স্মরণ কর, তবেই যথেষ্ট। মিশে যাবার দরকার নাই। মিশে গেছ বা মিশেছ কি না, দেখতে যেও না। স্মরণ কর শুধু। মনে কর, 'আমি মিশে যাচ্ছি।' আর মনে মনে মন্ত্র জপ করো।

প্রঃ- বাবা, তোমার দেওয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করবো। তোমার দেওয়া আর একটা মহানাম যে আছে, সেটাও তো মাঝে মাঝে করবো?

উঃ- সেটা উচ্চৈস্বরে বলবে। রাধা যখন ধ্যানে বসলেন, তিনি কৃষ্ণকে দেখলেন। রাধা যেমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদেন, কৃষ্ণও তেমনি রাধা রাধা বলে কাঁদেন। আর বলেন 'হে রাধা। আমি যেথায় যেথায় ঘুরি, রাধা ছাড়া কিছু দেখি না, রাধা ছাড়া কিছু জানি না।' রাধাও বলেন, সদা একই কথা, 'আমি কৃষ্ণ ছাড়া জানি না।' তাই সদা সর্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলে রাধা সদা ডাকতেন। ধারার মত এমনই কৃষ্ণ নামে রাধা তন্ময় হযে থাকতেন। রাধা ছিলেন এই ধারাতে। তোমরা কি করছো? রাধা শুধু একাই রাধা নন। সেই রাধাশক্তি ধারণ করেছে জগতের প্রতিটি জীব। এই জীবলোকে তাই তোমরাও সেইভাবে হলে রাধা।

পার্বতী যখন শিবকে বন্দনা করতেন, তখন বলতেন ''রাম নারায়ণ রাম।'' পার্বতী সদা সর্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে শিবেরই রূপ, শিবেরই সুর খুঁজে পেতেন, আর যখনই শিবের দর্শন পেতেন, তখন শিবকে বন্দনা করেই বলতেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' শ্বাসে প্রশ্বাসে বলতেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' হাঁটতে চলতে পার্বতী শুধু বলতেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' শিবশম্ভু ত্রিশূল হাতে যখন এদিক ওদিক যেতেন, তাঁর সর্বাঙ্গে ফুটে বের হতো ''রাম নারায়ণ রাম।'' বিষ্ণু যখন চতুর্বাহু বের করে যেতেন, তাঁর সর্ব অঙ্গে, চোখে মুখে ফুটে উঠতো, বেজে উঠতো, ''রাম নারায়ণ রাম।''

পার্বতী যখন শিবকে বন্দনা করতেন, তখন বলতেন ''রাম নারায়ণ রাম।'' পার্বতী সদা সর্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে শিবেরই রূপ, শিবেরই সুর খুঁজে পেতেন, আর যখনই শিবের দর্শন পেতেন, তখন শিবকে বন্দনা করেই বলতেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' শ্বাসে প্রশ্বাসে বলতেন, ''রাম নারায়ণ রাম।''

বেদজ্ঞরা যখন আকাশপথে বিরাজ করতে লাগলেন, তারা দু'বাহু তুলে 'রাম নারায়ণ রাম,' 'রাম নারায়ণ রাম,'' এই বলে চোখের জল

ফেলতে লাগলেন। বেদজ্ঞরা ঋষিরা যখন আপনগতিতে আকাশপথে বিচরণ করতেন, তাঁরা লিখতে শুরু করলেন। তখন আপনগতিতে তাঁদের নিজহস্তে কি যে লিখছেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন না। কি যে লেখা বের হচ্ছে দেখতে গিয়ে দেখলেন, তাঁদের হাত থেকে 'রাম নারায়ণ রাম' লেখা বের হচ্ছে। ঋষিরা, বেদজ্ঞরা ভাবতে লাগলেন, কেন বারবার 'রাম নারায়ণ রাম' বের হচ্ছে? কেমন করে বের হচ্ছে? তাঁরা ভাবতে লাগলেন, কি করিয়া বাহির করিবেন, 'রাম নারায়ণ রাম' তত্ত্ব। খুঁজতে খুঁজতে যখন তন্ময় হযে গেলেন, তখন তাঁরা স্বপ্নে দেখতে লাগলেন, ''তোমরা বলো, রাম নারায়ণ রাম।''

''রাম নারায়ণ রাম'', এই কথা বললে যখন সর্ব কথা হয়, এই কথা বললে যখন সবকিছু জানা যায়, তখন সব বেদজ্ঞরা, ঋষিরা, দেবতারা দুই বাহু তুলে বললেন, ''তোমরা সবাই দুই বাহু তুলিয়া বলো, 'রাম নারায়ণ রাম'।'' এই কথা বলতে বলতে তাঁরা আকাশের গতিতে, আকাশের গতির পথে, আকাশ পথে চলতে চলতে দেখলেন, সর্ব আকাশটা যেন হয়ে আছে, ''রাম নারায়ণ রাম।'' যেদিকে যান, যেদিকে তাকান সবদিকেই দেখেন ''রাম নারায়ণ রাম।'' মহাকাশে খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন, সব জায়গাটি ফাঁকা। আবার ''রাম নারায়ণ রামের বর্ণনা যখন খুঁজতে লাগলেন, দেখলেন সবই আঁকা। এই আঁকা এবং ফাঁকার মাঝেই সব। আঁকা এবং ফাঁকা, একই কথা। এইভাবে সমস্ত পৃথিবীতে বেদজ্ঞরা দেবতারা ঋষিরা জানিয়ে দিলেন একমাত্র কথা, একটি কথা আছে ''রাম নারায়ণ রাম।'' পৃথিবীর মুক্তি, জীবের মুক্তি, এতেই রয়েছে সবার মুক্তি। এক এক আসনে বসে আছ যারা, সদা সর্বদা শুধুমাত্র বলো, 'রাম নারায়ণ রাম।'

মহাকাশে খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন, সব জায়গাটি ফাঁকা। আবার ''রাম নারায়ণ রামের বর্ণনা যখন খুঁজতে লাগলেন, দেখলেন সবই আঁকা।

বেদজ্ঞরা সমস্ত দেবতাদের, ঋষিদের ডাকালেন। শুধু এই পৃথিবীর নয, কোটি কোটি পৃথিবীর সব মহানদের ডাকালেন একটা পৃথিবীতে। সর্বজগৎ হতে সব ঋষি একত্রিত হলেন। তাঁরা সবাই মহান, দেবতা। সেই পৃথিবীতে এসে হাজির হলেন। কিভাবে জীবের মুক্তি হয়, কোন্ শব্দ কোন্

ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আকাশে বাতাসে হাঁটতে চলতে শুধু একই কথা বলবে, ''রাম নারায়ণ রাম।''

কথা বললে জীবের সব কিছুর সমাধান হয়, তাঁরা বাহির করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা চক্ষু বুঁজে বসে বিশ্বের ধ্বনিকে আহ্বান করে একটি শব্দ নিয়ে আসলেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' সমস্ত দেবতারা, সমস্ত ঋষিরা একই সুরে বললেন, রাম নারায়ণ রাম। তাঁরা বের হয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' আকাশপথে একবার বলো, ''রাম নারায়ণ রাম।'' এই পৃথিবীতে একটিমাত্র আছে কথা, ''রাম নারায়ণ রাম।'' সমস্ত জগৎ থেকে সব ঋষিরা একটা গ্রন্থ পাঠালেন। সেই গ্রন্থের পাতা আলোর মত, সূর্যের মত তার তেজ। এই গ্রন্থটিকে পাঠালেন শিব এবং বিষ্ণুর হস্তে। সেই গ্রন্থটি হচ্ছে ১০৮ পাতার। এই ১০৮ পাতা মুখস্থ করার জন্য তাদের উপর নির্দেশ হলো। বিষ্ণু এবং শিব একত্রে বসে পাঠ করছেন। প্রথম পৃষ্ঠায় পাঠ করলেন ''রাম নারায়ণ রাম।'' দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঠ করলেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' তৃতীয় পৃষ্ঠায় পাঠ করলেন, ''রাম নারায়ণ রাম।'' শিব এবং বিষ্ণু তখন এর অন্তর্নিহিত অর্থে প্রবিষ্ট হলেন। তাঁরা দুজনে মিলে একত্রিত হয়ে দেখলেন, গ্রন্থের নবম পৃষ্ঠায় ''রাম নারায়ণ রাম।'' তখন তাঁরা এই কথা বলে স্বাক্ষর দিলেন জীব জগৎকে যে, তোমরা সকলে মিলে সেভাবে বলবে, ''রাম নারায়ণ রাম।'' এইভাবেই তারা জীবলোকের পথ পরিষ্কার করে গেলেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আকাশে বাতাসে হাঁটতে চলতে শুধু একই কথা বলবে, ''রাম নারায়ণ রাম।'' তাঁরা নিজেরাও এই সুর হয়ে গিয়ে জীব কে বলে গেলেন, তোমরা এই নাম করবে। তাই একদিকে যে বীজ আছে, তা মনে মনে স্মরণ করবে। আর এই মহানাম করবে, ''রাম নারায়ণ রাম।''

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মনই সৃষ্টির উৎস

পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা

(১৩-০৬-১৯৬৫)

সন্ধ্যা ৭-২০ মিঃ থেকে ৮-১০ মিঃ

মূর্ত্তি চিন্তা যারা করে, মূর্ত্তির চিন্তায তারা তন্ময় হয়ে থাকে। মূর্ত্তির চিন্তায় নিবিষ্ট থেকে অন্তরের মাধুর্য দিয়ে যার যার রুচি অনুযায়ী একেকজন একেকটি মূর্ত্তি তৈরী করেছে। সৃষ্টির আদিতে একবারেই মানুষ সৃষ্টি হয়নি। আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনের ধারায় ধারায় সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে রূপের পর রূপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আমূল পরিবর্ত্তনের সময় যে রূপ ছিল, তাই পরিবর্ত্তিত হতে হতে মানুষের রূপ ধারণ করলো।

সৃষ্টির আদিতে একবারেই মানুষ সৃষ্টি হয়নি। আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনের ধারায় ধারায় সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে রূপের পর রূপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আমূল পরিবর্ত্তনের সময় যে রূপ ছিল, তাই পরিবর্ত্তিত হতে হতে মানুষের রূপ ধারণ করলো।

এখন কোন রূপ চিন্তা করলে, কি করে সেই রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়? চক্ষু বুজে যখন ধ্যান করা হয়, সেই ধ্যানস্থ অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা যারা মূর্ত্তি দর্শন করেন, মূর্ত্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন, 'সিদ্ধিলাভ করেছেন' একথা বলেন, 'মুক্তি হয়েছে', একথা বলেন, ধ্যানের মূর্ত্তিগুলো কি করে সামনে এসে উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা কি জাগে না? শূন্যের ভিতর দিয়ে মূর্ত্তিগুলো কি করে আসে? কোন্ পথ ধরে এরা আসে, সেটা জানা

থাকলে কাজের সুবিধা হয়। শাস্ত্রে, পুঁথিতে, খাতায় পাতায় অনেক কিছু লেখা আছে। তার চেয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানা দরকার, কি করে আসে? একজনকে ডাক দিলে যেমন দৌড়িয়ে আসে, এটাই দেখা যায়। একশো হাত দূরে কাউকে যেভাবে ডাকবে, পাঁচহাত দূরের ব্যক্তিকে সেভাবে ডাকবে না। গলার সুর ওঠানামা করে দূরত্বের উপর। ধ্যানে ডাকাডাকির ঐরকমটা জানা থাকলে সুবিধা হতো। মূর্ত্তি দর্শন হবে কি না, ধ্যানে আসবে কি না, ডাক শুনবে কি না? আদৌ শোনা যায় কি না? দ্বন্দ্ব তো থেকেই যাচ্ছে। তারপর দর্শন না হলে যার যার নিজের কর্মফলের উপর ফেলে দেওয়া হয়। যার ফলে কোন সমাধান হয় না। ধ্যানের মাধ্যমে কি ভাবে আসে? শত কাজে যাঁরা ব্যস্ত সেই দেবদেবীগণ কোন্ পথ দিয়ে মূর্ত্তি ধারণ করে কিভাবে আসেন? এটা জানা দরকার। সাধারণতঃ আমরা যেই মন নিয়ে একাগ্রভাবে কোন চিন্তায় (ধ্যানে) বসি, সেটা ভক্তিমূলক অথবা জ্ঞানমূলক যাই হোক না কেন, এটা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ধ্যানের মধ্যে মূর্ত্তির দর্শন এবং আগমন, তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আদৌ মেলে না।

সাধারণতঃ আমরা যেই মন নিয়ে একাগ্রভাবে কোন চিন্তায় (ধ্যানে) বসি, সেটা ভক্তিমূলক অথবা জ্ঞানমূলক যাই হোক না কেন, এটা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ধ্যানের মধ্যে মূর্ত্তির দর্শন এবং আগমন, তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আদৌ মেলে না।

এই দেহ ধারণের যে নিয়ম, যে খাদ্য, জল, বাতাস নিয়ে দেহ গঠন হচ্ছে, এটাও মনের উপর নির্ভর করেই হচ্ছে। এটাও মনেরই খেলা। মন মনন করছে, ইন্দ্রিয়গুলো সেইপথে সেইভাবে চালিত হচ্ছে, দেহ গঠন হচ্ছে। এই স্থূলদেহ একদিন এমন অবস্থায় ছিল, এত সূক্ষ্ম ছিল যে, খুঁজে বের করা যেত না। এই যে হাতী, এত বৃহৎ প্রাণী, একদিন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে একে খুঁজে বের করা যেত না। তাহলে স্থূল হতে সূক্ষ্মচিন্তায় মনন করা যায়। সেই ভাষাতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাশক্তির মননে হারিয়েই যেতে হয়। সেই সূক্ষ্ম পদার্থ এই জল, বাতাস, তেজ হতে যদি দেহ গঠিত হয়, তবে সূক্ষ্ম পদার্থ হতেই যে জগতের সৃষ্টি, সহজেই অনুমান করা যায়। জল গেলাসে নিয়ে খাওয়া যায়। আবার জল বাষ্প অবস্থায় শুকিয়ে নেওয়া যায়। জল কোন পাত্রে নিয়ে রাস্তায় ছিটিয়ে দেওয়া যায়। নিদাঘের রাগে সাগরের

জল আকাশে গিয়ে জমা হয় আমাদের চোখের আড়ালে। এই যে তাপে জলকে টেনে নিয়ে যায়, এটাও মনন শক্তি।

মন কেবল মানুষ, জীবজন্তুর মধ্যেই থাকে না। সূর্যে, বাতাসেও মন আছে। আকাশের ভিতর প্রতি বস্তুর বস্তুত্বে মন আছে। মন আছে বলেই মনন শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের মাঝে যদি চৈতন্য না থাকতো, এই জগৎ প্রকাশিত হতো না। মহাশূন্যের প্রতিটি কণাশক্তির ভিতর বস্তু আছে, চৈতন্য আছে, মন আছে। সবটা মিলেই গর্ভণমেন্ট। চৌকিদার হতে প্রেসিডেন্ট অবধি, একটি কথা গর্ভণমেন্ট। মন যদি বিচার করা যায় আর মনকে খুঁজতে যাওয়া যায়, তাহলে খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়ে যেতে হয়। হাজার বছর লেগে যাবে শুধু যদি মনের সংজ্ঞা দিতে যাও। কয়টা বাবার নাম জানবে? তার বাবা, তার বাবা, তার বাবার তালিকা দিতেই হাজার বছর লেগে যাবে। এই যে অগণিত সৃষ্টি, প্রতিটি বস্তুর বস্তুত্ব বা মন খুঁজতে গেলে সব নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। সব তো জানানো সম্ভব নয়। এই সৃষ্টির মাঝে সবটাই মন। সূর্য হতে যে চৈতন্য, যে মন জীবদেহে প্রকাশিত, তাতেই জীব চৈতন্যময়, মনোময়। মনের দ্বারাই চিন্তা ভাবনা, জাগতিক যাবতীয় কার্যকলাপ, সবকিছু।

সূর্যের মাঝে যদি চৈতন্য না থাকতো, এই জগৎ প্রকাশিত হতো না। মহাশূন্যের প্রতিটি কণাশক্তির ভিতর বস্তু আছে। চৈতন্য আছে, মন আছে।

আমরা সবসময় একটি কথাই বলি, 'মন ভাল লাগে না।' ভালবাসা, প্রেম, ঝগড়া বিবাদ, যাবতীয় যা কিছু সব মনের খোরাক। কারও পাহাড় চিন্তা করতে ভাল লাগে। তাকে ইটা (ইট) দিলে ভাল লাগবে না। কারও আবার সাগর চিন্তা করতে ভাল লাগে, তাকে একঘটি জল দিলে ভাল লাগবে না। সূর্য প্রভাতে লাল হয়ে আকাশে ওঠে। ভোরের সূর্যকে দেখতে কার না ভালো লাগে? আবার পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রকে দেখলে, জ্যোৎস্নার

ভাল লাগাটা হচ্ছে একধরণের আত্মতৃপ্তি; এক ধরণের বৃত্তির নিবৃত্তি। ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের) প্রতি স্তরে স্তরে নিবৃত্তির যে প্রয়োজন, আমরা সেটি সংগ্রহ করে ওর মধ্যে মনন করে করে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেটি প্রবিষ্ট করাচ্ছি, রক্তচোষার মত।

আলোকে আলোকিত চারিদিকে তাকালে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় মন ভরে যায়। মানুষকে মানুষ চিন্তা করে। কিন্তু মরা মানুষকে চিন্তা করতে ভাল লাগে না। ভাল লাগাটা হচ্ছে একধরণের আত্মতৃপ্তি; এক ধরণের বৃত্তির নিবৃত্তি। ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের) প্রতি স্তরে স্তরে নিবৃত্তির যে প্রয়োজন, আমরা সেটি সংগ্রহ করে ওর মধ্যে মনন করে করে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেটি প্রবিষ্ট করাচ্ছি, রক্তচোষার মত।

পাহাড়ে গিরগিটির মত একরকম পোকা আছে। এরা ১০০ থেকে ২০০টা পোকা একত্রে থাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। হয়তো দেখলো একটা জংলী গাভী ঘুমাচ্ছে। ওকে পোকাগুলি চারিদিক থেকে বেড় দিয়েছে। পুলিশে যেমন ঘেরাও করে, তেমনই। তারপর পেটে পাম্প দিয়ে দিয়ে টানের মত জোরে জোরে টেনে গাভীকে একেবারে রক্তশূন্য করে শেষ করে দেয়। এই রক্তচোষাগুলি আবার প্রত্যেকে প্রত্যেককে সামলিয়ে সামলিয়ে চলে, যেন নিজেরা নিজেদের কবলে না পড়ে। একটা নিরাপদ distance-এ (দূরত্বে) থাকে। নাহলে, অনেকসময় নিজেরা নিজেদের রক্ত টেনে নেয়।

এই যে জোনাকি পোকা, হাজার হাজার ব্যাটারি, কি সুন্দর জ্বলছে। সূর্য রশ্মিরই তাপের অংশ জোনাকি পোকা, সূর্যের প্রদত্ত বস্তু। সূর্য রশ্মির ব্যাটারি শক্তি ছেড়ে দিলে জোনাকি পোকার মাঝে গিয়ে গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনে এ্যাক্শন হয়ে জ্বলতে থাকে। ঐ সিক্রেশনে সব টেনে নেয়। সূর্য রশ্মি কিভাবে জলস্রোতের মত আমাদের গায়ের উপর দিয়ে আমাদের সব কিছু টেনে নিচ্ছে। সূর্যের তাপ ৯০° ডিগ্রীতে জল টেনে নেয়। সূর্যের তাপ ১০৭° থেকে বেড়ে গিয়ে যদি ১২০° ডিগ্রী হয়, তবে এক্স-রেতে Ray এমন কাজ করবে যে, হাড়্ডি (হাড়) ফটোতে উঠে যায়। X-ray-তে এমন সূক্ষ্ম Ray আছে যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটা হয়ে যায়। এটার মধ্যেও মন আছে। মনন শক্তি কোন্ অংশের ভিতর কিভাবে কার্যকরী হবে তার আপনগতিতে আপনধারায়, সেটা সর্বদা ব্যাখ্যা করে বলা আদৌ সম্ভবপর নয়।

একটি শিশুর সব ইন্দ্রিয় আছে, সব কিছু আছে। ওকে যদি বল,

বৃত্তির নিবৃত্তি করার উন্মাদনায় সমস্ত জীবকুল যে যাচ্ছে, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী কাম করিয়ে নিচ্ছে। এই ক্ষুধা নিবারণ হল। আবার এক ঘন্টা পরে ক্ষুধা লাগছে। যেই উত্তেজনায় উন্মাদনায় বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাতেই সৃষ্টি হয়ে যায়।

'একটা বাচ্চা দাও', সে (শিশুটি) কিছুই বুঝতে পারবে না। এই শিশুই যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ বড় হতে থাকে, তখন ওর একটা স্তর আছে, যেটা সৃষ্টি করার জন্য খোঁচায়। তোমরা যাকে কাম বল, সেই কামটা শুধু এমনি কাম নয়। সমস্ত জীবজগতকে কামে (কাজে) লাগাবার জন্য এই কাম দিয়ে দিয়েছে। তুমি মনে করছো, তোমার ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করছো, বৃত্তির নিবৃত্তি করছো। বৃত্তির নিবৃত্তি করার উন্মাদনায় সমস্ত জীবকুল যে যাচ্ছে, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী কাম করিয়ে নিচ্ছে। এই ক্ষুধা নিবারণ হল। আবার এক ঘন্টা পরে ক্ষুধা লাগছে। যেই উত্তেজনায় উন্মাদনায় বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তাতেই সৃষ্টি হয়ে যায়। যে কারণে উত্তেজনা হয়, রাগ হয়, মেজাজ হয়, তাতেও সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা দূর হলে, রাগের উপশম হলে, মেজাজ কমে গেলে বৃত্তির নিবৃত্তিই তো হল। ফলে সেখানেও কিছু না কিছু সৃষ্টি হল। এতে যে অপরূপ পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে দেহের ভিতর দিয়ে, এটা মনেরই খেলা। এই মন দেহের ভিতর দিয়ে চিন্তায় ভাবনায় নানা বিষয়বস্তুকে, মহাশূন্যের অনন্ত শক্তিকে টেনে আনছে নিজের ভিতরে, তখনই মনন করছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী বিষয়বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট আছে বলেই, ধারাবাহিক নিয়মানুযায়ী সবকিছু কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে। আমরা ইন্দ্রিয়ের সেবা করে চলেছি। এইভাবে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

মনে কর, মন সৃষ্টি ছাড়া থাকতে পারে না। মনে কর, তুমি সূর্যকে চিন্তা করছো। একটা তাপ, একটা জ্যোতি, একটা আলোর চিন্তা করছো। সূর্য বা চন্দ্র চিন্তা করছো। সূর্য সুন্দর লাল হয়ে উঠছে। দিনের পর দিন সূর্য চিন্তা করছো। তাতে কি হচ্ছে? মনটাও আলোর সাথে, তাপের সাথে মিশে গিয়ে আলোময় হয়ে যাচ্ছে, তাপময় হয়ে যাচ্ছে। জলটা নিয়ে এসে আমরা যেভাবে ফেলি,

সূর্য চিন্তা অনেকেই করতে চায় না। সর নাই, কষ নাই, কিচ্ছু নাই। সূর্য উঠল, আবার ডুবলো। ভাল লাগে না। তবু প্রকৃতি বলছে, 'তুমি বসো। আজ্ঞাচক্রে নিবিষ্টমনে সূর্য চিন্তা করো।'

এতবড় সূর্য, তার যে বীর্য, তার যে সূক্ষ্মভাব তোমার চিন্তার ভিতর প্রতিফলিত হল। সূর্যকে চিন্তা করতে করতে যে রস হল, যে বীর্য হল, যে বীজ হল; ক্রমে ক্রমে গ্ল্যাণ্ডের ভিতরে সেই বীজ বপন হল।

মনটা ঠিক সেভাবে যাচ্ছে। জল যে ভাবে যায়, মনের গতি ঐভাবে যাচ্ছে। আমি চাইছি, একটা ঊর্ধ্বমুখী চিন্তার দ্বারা মনের গতিকে কিভাবে ঊর্ধ্বমুখী করা যায়। আমি দেখবো এই গতিটা। তোমার ভিতরে যদি এইভাবে চিন্তা কর মনের গতিটাও সেইভাবে সেইমুখী হবে। সূর্য চিন্তা অনেকেই করতে চায় না। রস নাই, কষ নাই, কিচ্ছু নাই। সূর্য উঠল, আবার ডুবলো। ভাল লাগে না। তবু প্রকৃতি বলছে, 'তুমি বসো। আজ্ঞাচক্রে নিবিষ্টমনে সূর্য চিন্তা করো।' ১৫ মিনিট ধীর স্থির ভাবেবসে চিন্তা আরম্ভ করেছো। কতদিন পর আবার এইভাবে ঊর্ধ্বচিন্তা শুরু করেছো। ক্রমে ক্রমে চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেছো। সূর্য কখনও অসে না। তবে কে আসে? রাত ১২-টার সময তুমি সূর্য দেখছো। সূর্য তখন আর একদেশে বসে আছে (উদয় হয়েছে)। সূর্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু আছে, যে বিষয়বস্তু দ্বারা সূর্যের গঠন হয়ে আছে, তোমার মনের চিন্তাধারার সাথে সাথে সেইসব বিষয়বস্তু তোমার ভিতরে খেলতে থাকে। খাদ্যের মত ভিতরে চলতে থাকে। তুমি একাগ্রমনে সমানে সূর্যের চিন্তা করে যাচ্ছ। ধর, সূর্যের মাত্রা ১ লক্ষ ডিগ্রি। তোমার মাত্রাটা লক্ষ ডিগ্রি হয় নাই। না হলেও হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, তাতে তোমার গ্লান্ডের ভিতরে এসে বাড়ি খাচ্ছে। একটা ক্যামেরায় যেমন ব্যবধানে থেকেও ঔষধের (কেমিকেল) গুণে ব্যক্তির চেহারা উঠে যায়। লেন্সের গুণে এটা হয়। কাগজে যে ঔষধ থাকে, ওটা পট করে টেনে নেয়। কি সুন্দর দেখ। যত পাওয়ারফুল লেন্স হয়, তত ভাল ফটো হয়। আর সত্যিকারের গ্ল্যান্ড এবং সত্যিকারের লেন্সে জাগ্রত ফটো কিভাবে হয়? সূর্য ওঠার সুন্দর দৃশ্যটা তোমার মনের মাঝে কি করলো? চিন্তায় চিন্তায় সেই জাগ্রত গ্ল্যান্ড এবং লেন্সের বিরাট পাওয়ার (শক্তি) ঔষধের ক্রিয়ার মত ভিতরে ভিতরে টানছে। হাতে তোমার বটবীজ, বটগাছ। পাখী বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে, দেওয়ালের উপর সুন্দর গাছ হয়ে গেছে। দেওয়ালের বটগাছ কি বটগাছ নয়? সেই দেওয়ালে মাটির কিছুই নেই। তবু দেওয়াল থেকেই রস নিয়ে রসের টানে বেড়ে উঠেছে। এতবড় সূর্য, তার যে বীর্য, তার যে সূক্ষ্মভাব তোমার চিন্তার ভিতর প্রতিফলিত হল। সূর্যকে চিন্তা

করতে করতে যে রস হল, যে বীর্য হল, যে বীজ হল; ক্রমে ক্রমে গ্ল্যান্ডের ভিতরে সেই বীজ বপন হল। তন্ময়তার গভীরতায় সূর্যের যে বীজ, তার যে বীর্য তোমার ভিতরে আস্তে আস্তে করে ব্লুজম্ (Blooson) হল, প্রস্ফুটিত হল। গ্ল্যান্ডে এই বীজ লাগানো থেকে অঙ্কুরিত হল, বিকশিত হল। আস্তে আস্তে করে তোমার ভিতরে সহস্রারে সহস্র সূর্যের শক্তির প্রকাশ হল।

সিনেমাতে দেখা যায়, সামনে একটা সাদা কাপড়। পিছনের দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না, ওটায় কি আছে। আসল খেলা পিছনে। আমরা দেখি সামনে। এও ঠিক তাই। যত খেলা এই দ্বিদলে, আজ্ঞাচক্রে। সব এখানকারই (আজ্ঞাচক্রের) খেলা। সব পাওয়ারই (শক্তি) এখানে (আজ্ঞাচক্রে) আছে। তিনি প্রস্ফুটিত হচ্ছেন। আর এই স্ক্রিন (screen), এই বিশ্বসংসার সামনে দেখা যায়। অতটুকুতে আর কি হবে? মহাশূন্যের কণাশক্তি থেকে, বীর্যকণা থেকে সূর্য যখন প্রথম সৃষ্টি হলো, সেই বীর্যকণা এই দ্বিদলে এল। চাঁদের আলো আর জোনাকি পোকার আলো, মৃদু হলে কি হবে, আলো তো হলো। রাত দুটোর সময কল (সজাগ) করে। এখানে দ্বিদলে গোল হয়ে দেখা দেয় সূর্য। কি সুন্দর। মনে হয়, ভোর হয়ে গেছে বুঝি, মানে ফুটছে। বুঝে বলছে, 'হা ঠাকুর, হা ঠাকুর। আমি কিছু জানি না, তুমি জান।' সব রোল করছে। চক্ষু বুঁজেও দেখে, চক্ষু মেলেও দেখে। তারপর আবার শেষ। আড়াই ঘন্টার সিনেমায় জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের খেলা দেখিয়ে দেয়। আর ঐ শক্তি এমনই জিনিস ৫ মিনিটেই দেখিয়ে দেয়।

মহাশূন্যের কণাশক্তি থেকে, বীর্যকণা থেকে সূর্য যখন প্রথম সৃষ্টি হলো, সেই বীর্যকণা এই দ্বিদলে এল। চাঁদের আলো আর জোনাকি পোকার আলো, মৃদু হলে কি হবে, আলো তো হলো। রাত দুটোর সময কল (সজাগ) করে। এখানে দ্বিদলে গোল হয়ে দেখা দেয় সূর্য। কি সুন্দর। মনে হয়, ভোর হয়ে গেছে বুঝি, মানে ফুটছে।

এমন পোকা আছে ১ ঘন্টা পরমায়ু। ২১ মিনিট বিয়ে দিয়েছে। ২৪ মিনিট বিয়ে হয়ে গেছে। এর মধ্যে বাচ্চা আরও কত কি, বয়স কত? ১ ঘন্টা।

-- তাহলে, আপনি তো অনেক দিনের কথা জানেন।

ওদের ১ ঘন্টা হতে মানুষের ১০০ বছর লাগে। আজ মানুষের পরমায়ু ৭০/৮০ বছরের পর ক্রমে ক্রমে যখন ২৪ ঘন্টা হবে, তখন ১০ মিনিটে বিয়ে হ'ল। ছেলের বয়স কত? বলছে, ৪৫ মিনিট। আর একজন বলছে, বয়স ৩ ঘন্টা। তার ২৪ ঘন্টা হ'তে দেখ, কত সময় লাগে। সূর্যের ২৪ ঘন্টায়, আমাদের লক্ষ ঘন্টায় যা হয়। এই ২ মিনিটে সব হয়ে যাচ্ছে। সূর্যকেই চিন্তা করে যাও। সূর্য যত বড়, যত তার দূরত্ব, যত তার ব্যবধান, ৫ মিনিটের মধ্যে বিশ্বের সব খেলা রোলের ন্যায় চলছে।

সাগর পড়ে আছে। হাজার লোক লাগিয়ে, হাজার কোদাল নিয়ে, নদীর লগে লাগিয়ে গর্ত করে করে চলছে। এতে নদীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে বিরাট খাল হয়ে গেছে। কেবল মাটি কেটে চল। এক এক কোদাল মাটি কাটছে, সাথে সাথে হাজার কোদাল পড়ছে। সাগরের সাথে যোগাযোগও এইভাবেই হবে। সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তের সূর্য চিন্তায়, প্রতি মুহূর্ত্তের কাজে একদিন দেখা গেল, সূর্য দেখা দিল। চিন্তায় ভাবনায় ধ্যান ধারণায় সূর্যের সাথে মিশে গেল। সূর্য তার আলো, অগণিত আলো, কোটি কোটি আলোর রশ্মি তোমার ভিতরকার সত্তায় জেগে উঠল। সূর্যের যে ক্ষমতা, সেটাই সৃষ্টির ক্ষমতা হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি যেদিকে তাকায়, সূর্যের যতগুলি তেজো শক্তি আছে, সবগুলির সাথে তার যোগাযোগ হয়ে যাওয়াতে জাগতিক সুর সব বুঝতে পারছে। সূর্যের ক্ষমতা তো। কি বিরাট, অফুরন্ত ভান্ডার। পৃথিবী তো সূর্যের তুলনায় একটা মটর ডাল। একটা বীজ পুঁতলে বটগাছে একটা বীজ হয় না। দেখা যায়, ২৫/৩০ হাজার বীজ। সূর্যের চিন্তায় এইরূপ এত বীজ শক্তি এসে তোমার ভিতরে স্ফুরিত হয়েছে যে, সহস্র সহস্র সূর্যের ক্ষমতার অধীশ্বর তুমি হয়েছ। আর একটা বীজ যদি পুঁতে দাও, আবার ২৫ হাজার। এইভাবে যদি বীজ পুঁতে যাও, আর প্রতি বীজে ২৫ হাজার বীজ শক্তির স্ফূরণ হতে থাকে, তবে তোমার শক্তির বিকাশ হবে অফুরন্ত, যেটাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

প্রতি মুহূর্ত্তের সূর্য চিন্তায়, প্রতি মুহূর্ত্তের কাজে একদিন দেখা গেল, সূর্য দেখা দিল। চিন্তায় ভাবনায় ধ্যান ধারণায় সূর্যের সাথে মিশে গেল। সূর্য তার আলো, অগণিত আলো, কোটি কোটি আলোর রশ্মি তোমার ভিতরকার সত্তায় জেগে উঠল। সূর্যের যে ক্ষমতা, সেটাই সৃষ্টির ক্ষমতা।

একটা ইলিশ মাছের দু'টো খলতের মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বীজ থাকে। একটা ইলিশের দুটো খলতের মধ্যে যত কোটি মাছ থাকে তাতে একটা নদী ভরে যাবে। সূর্যশক্তির এক একটা বীজে এতগুলি বীজশক্তি থাকে যে, যেন অফুরন্ত ভান্ডার থেকে অফুরন্ত শক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জল যেমন যায়, বাতাস যেমন যায়, মনন শক্তি আকাশময় হয়ে সূর্যশক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে সূর্য আর মন তখন এক হয়ে যায়। সব যে এক হয়েই ছিল, তারই বিকাশ হয়। অনন্ত মহাকাশে, অনন্ত মহাশূন্যে তখন তোমার সত্তা, তোমার জাগতিক সত্তা আর সেই সূর্যশক্তির সত্তা এক হয়ে যায়।

সূর্যশক্তির এক একটা বীজে এতগুলি বীজশক্তি থাকে যে, যেন অফুরন্ত ভান্ডার থেকে অফুরন্ত শক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জল যেমন যায়, বাতাস যেমন যায়, মনন শক্তি আকাশময় হয়ে সূর্যশক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে সূর্য আর মন তখন এক হয়ে যায়।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

যত্র জীব তত্র শিব

পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা

(০৭-০২-১৯৬৫)

সময় ঃ- সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ থেকে ৭-২৫ মিঃ

এই বিশ্ব সবটাই কতগুলো স্তরে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং এই অনন্ত মহাশূন্যে একটা সুর বয়ে যাচ্ছে। ধরার ধারাবাহিকতার ধারায় সৃষ্টি স্তরে স্তরে পরিস্ফুট হচ্ছে। অহর্নিশ যে সুরটা বইছে, কোন্ শব্দকে নিয়ে সুরটা যাচ্ছে? এই যে সূর্য আছে, প্রভাতে একরকম দৃশ্য; প্রভাতের পর দৃশ্যটা পরিবর্তন হতে থাকে। সূর্য মাথার উপর যখন, তখন এক অবস্থা; সূর্য ডুবে গেলে আরেক অবস্থা। এই যে পরিবর্তন, আমাদের জীবনটাও ঠিক সেরকম। ক্রমশঃ বিভিন্ন স্তর ভেদ করে শেষ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। সূর্য যেমন উঠে এবং অস্ত যায়; সূর্যের এই উদয় এবং অস্ত অবস্থাটা, প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছি। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্টির নিয়ম ঐ সুরের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

সূর্য যেমন উঠে এবং অস্ত যায়; সূর্যের এই উদয় এবং অস্ত অবস্থাটা, প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছি। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্টির নিয়ম ঐ সুরের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

বীজ, অঙ্কুর, ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে গাছ, সময়ে ফুল, ফল। আমরা

মিলতে মিলতে এমন একটি পর্যায়ে যাব, যখন সেই সুরের সঙ্গে একত্র হতে পারবো, মিলে যাব সহস্রারে। এক সাধক, সাধক কেন, এই শিব যখন বসলেন, তিনি এই মূলাধার হতে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক জায়গায় বিভিন্ন রং আছে। সূর্যের যেমন বিভিন্ন রং, উদয়ের আভাষে একরকম মধ্যাহ্নে একরকম, অস্তে আরেকরকম। বীজ, গাছ, ফুল, ফল সব সুরের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। শিব বললেন, 'আমি দেখবো, জগতে কি আছে।' শিব জগতের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করলেন। 'মনকে কোথায় রাখলে সাড়া পাবো,' একথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় একজন বললেন, 'তুমি তোমার মূলগ্রন্থিতে মনকে নিবিষ্ট করে কাজ করে যাও'।

মূলগ্রন্থি কোথায়, খুজে পান না। তারপর মূলাধারে যখন মনকে নিবিষ্ট করলেন, আসলো বাধা, ঝড় ঝাপট্া। তিনি কি দেখলেন? চিন্তার সাথে সাথে আপনি সুর বের হতে লাগলো। শিব বসে বসে এগুলো বলছেন। তিনি দেখছেন, একটা নীলাভ নীল নীল ভাব। এমন একটা পরিবেশ তাঁকে ঘিরে ধরেছে। শিব বলছেন, ''হে বিশ্বস্রষ্টা, কিভাবে কি করিয়ে নিচ্ছ জানি না। এখন একটা স্বচ্ছ নীল আলো আমার চারিদিকে দেখছি। আলোটা আমায় ঘিরে ধরেছে। মনে হয়, এতদিন এই আলোতেই ছিলাম। মনে হয়, আমার ভিতর হতে এই আলো বের হচ্ছে। একটা স্বচ্ছ আলোর লাভা যেন গলে গলে বের হয়ে চারিদিক আলোকিত করে দিচ্ছে।'' তিনি ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরও এগিয়ে যেতে লাগলেন। যেতে যেতে দেখলেন, তাঁর ভিতরকার এক একটা গাঁট (গ্ল্যান্ড) ফট্ ফট্ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। এইভাবে তিনি যখন স্বাধিষ্ঠানে এলেন, মনে হলো, একটা গোলাপী গোলাপী রং তাঁকে চারিদিক হতে ঘিরে ধরেছে। এ রং কোথা থেকে এল? এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বহু রং-এ মেলানো। এই যে নীলের পর গোলাপী রং এতো তাঁরই ভিতরে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। দিনের পর দিন তিনি আরও এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর যখন মণিপুরের এলেন, অফুরন্ত ভান্ডার হতে অপরূপ রূপ ফুটে বের হতে আরম্ভ করলো। তিনি আলোর সাগরে এলেন। সেই আলোর

সব তেজেরই রূপ, সবটাই তেজ। তেজ হতেই জগৎ সৃষ্টি। তন্ত্র, মন্ত্র সবটাই তেজ।

তেজ দেখলে মনে হয়, শিব বলছেন, যেন কত ঘনিষ্ঠ, কত আপন। মনে হয়, অগণিত সূর্য এখানে। কত সূর্য, কত চাঁদ যেন গলে গলে সাগরের সৃষ্টি করেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখেন শুধু সাগর। সেই সাগরে বিরাট বিরাট ঢেউ। জলের সাগর নয়, আলোর সাগর। অদ্ভুত তার অপরূপ রূপ। ওর মধ্যে গুম্ গুম্ শব্দ। সাগরের ভিতরে যেমন প্রলয়ের ঢেউয়ের শব্দ হয়, তেমনি স্যাঁৎ স্যাঁৎ একটা শব্দ বাড়ি খাচ্ছে। ভয়ের কিছু কারণ নেই। সব তেজেরই রূপ, সবটাই তেজ। তেজ হতেই জগৎ সৃষ্টি। তন্ত্র, মন্ত্র সবটাই তেজ। বিরাট বিরাট ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আর গম্ভীর শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দটা, নিনাদের সেই সুরটা, সেই হচ্ছে মন্ত্র। তিনি ঐ শব্দটাকে উচ্চারণ করছেন। তারপর তিনি (শিবশম্ভু) ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরও এগিয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে 'অনাহত' ও 'বিশুদ্ধ' চক্র অতিক্রম করে তিনি আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হলেন। এখানে এত আলো, তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। আজ্ঞাচক্রে যেন দুধের সাগর। দুধে আলো, চাঁদের আলো পড়েছে, ঠিক যেন দুধে আলতায় গোলা আলোর রং। সেই সাগর এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় ভরা। ঢেউ নেই একেবারে, স্বচ্ছ সুন্দর মহিমময়।

আজ্ঞাচক্রে যেন দুধের সাগর। দুধে আলো, চাঁদের আলো পড়েছে, ঠিক যেন দুধে আলতায় গোলা আলোর রং। সেই সাগর এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় ভরা। ঢেউ নেই একেবারে, স্বচ্ছ সুন্দর মহিমময়।

শিব বলছেন, এত সুন্দর, এত সুন্দর দুধের সাগর। বাঃ এত স্নিগ্ধ, এত সাম্যতায় ভরা। বহু চাঁদের আলো ওতে (সেই আলোর সাগরে) পড়েছে। তিনি ক্রমশঃই ভিতরে ভিতরে মিশতে চাইছেন। তখন শিব বলছেন, 'আর পারছি না। আনন্দেও অরুচি ধরে যাচ্ছে।' তখন বলছেন, হে বিশ্বস্রষ্টা, এত রূপসজ্জা তুমি কেমন করে তৈরী করে রেখেছো? কি অপরূপ তুমি। হে স্রষ্টা, তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? তুমি কোথায়, করে করে তিনি আর্ত্তনাদ করছেন, চিৎকার করছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে, উন্মাদ হয়ে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। ভুলে গেলেন নিজেকে। মিশে যাওয়ার মধ্যে এমনভাবে মিশে গেলেন, যেখানে তাকান দেখেন তার নিজের রূপটা। তিনি সাগরময় হয়ে গেছেন, আলোময় হয়ে গেছেন। দেখেন তিনিই সব

জায়গায়। তাঁর রূপ সর্বত্র দেখতে আরম্ভ করলেন। তারপর তিনি আরও এগিয়ে সহস্রারে এলেন। এখানে সহস্র সহস্র সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়ে যখন বসলেন, তিনি চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এক গভীর ব্যথা তাঁকে আঘাত দিল। এ কোন্ জায়গায় এলাম? কি এক অপরূপ জায়গা; ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি কাঁদতে লাগলেন। শিব আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সবাই যেন তাঁকে চারিদিক হতে ঘিরে ধরে বলছে, 'শিব তুমি কাঁদছো কেন? তুমি তো বিরাট হয়ে গেছ। তোমার চোখে জল কেন?'

শিব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'এই বিশ্বের মাঝে, এই অপরূপের মাঝে, যেখানে জীবের কল্যাণে এত সুন্দর জিনিস সব এমনভাবে সাজানো আছে, সেখানে কেন জীবের মধ্যে ফুটে ওঠে না? কি করে জীবের ভিতরে জাগানো যায়? জীবলোকের ব্যথার জন্য, সেই দুঃখের জন্য, আমার ভিতরে যে ব্যথার বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তাকে আমি বাঁধ দিতে পারছি না। সমস্ত জীবলোকের জন্য যখন এমন আনন্দময় সত্তা আছে, সমস্ত জীব মাছি, মশা, পিপীলিকা থেকে আরম্ভ করে, সমস্ত জীবের ভিতরে এমন সুন্দরভাবে সাজানো আছে, তবে কেন জাগে না? দেহের মাঝেই আছে সব। যেই পর্দায় আছে আলো, সেই পর্দায় আছে চৈতন্য, সেই পর্দায় আছে সমস্ত সত্তা, সেই পর্দায় আছে মিলনের সুর। সেই পর্দায় নিজেকে স্বয়ং স্রষ্টা বলে, ভগবান বলে অভিহিত করা যায়, এমন ক্ষমতা। হে স্রষ্টা যে সহস্রারে এসে আমি দাঁড়িয়েছি, সকলকার ভিতরে জাগানোর ক্ষমতা আমাকে দাও। দ্বারে দ্বারে প্রতি জীবের মধ্যে, সকলকার ভিতরে যেন এই মহাধ্বনির কথা জানাতে পারি, জাগাতে পারি। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, সেই আকুলি বিকুলি প্রার্থনা নিয়ে শিব নেমে এলেন এই পৃথিবীতে। তাই শিব আতি সহজভাবে সবার মাঝে সুরধ্বনি ফুটিয়ে তোলার জন্য আজও দ্বারে দ্বারে বিরাজ করছেন। সেই মনোবৃত্তির বৃত্তি আজও তাঁর মধ্যে

হে স্রষ্টা যে সহস্রারে এসে আমি দাঁড়িয়েছি, সকলকার ভিতরে জাগানোর ক্ষমতা আমাকে দাও। দ্বারে দ্বারে প্রতি জীবের মধ্যে, সকলকার ভিতরে যেন এই মহাধ্বনির কথা জানাতে পারি, জাগাতে পারি।

সুপ্রতিষ্ঠিত। এই যে উপলব্ধি, এই যে অবস্থাটা সহস্রারের মধ্যে অনুভব করে আজও তিনি অপেক্ষা করছেন। আজও তিনি আসতে চান। জীবলোকের সকলকার ভিতর সেই ধ্বনি বেজে উঠুক, এই ইচ্ছায় আজও তিনি চির ব্যাকুল। সুপ্তভাবে বিদেহীভাবে এমনভাবে বিরাজ করছেন যে অল্প ডাকেই তিনি সাড়া দেন।

আমার যখন বাচ্চা বয়স দুজন সাধু এসে কল্কি সাজিয়ে আমাকে বলে, 'টান।'

আমি বলি, ভোলানাথ আর কল্কি খুঁজে পেল না। ফকির সাহেব, ধর। ভোলনাথ তো সব খেয়ে ফেলেছে। আবার কি।

সে বলে, তুমি টান।

আমি খালি হাতে একটান দেওয়াতেই কল্কি ফেটে গেল।

আমি বলি, বাবা ভোলানাথ, এখন আমি খালি হাতে দিলাম টান। কল্কি ফেটে গেল। এই যে শিব এসে আরেক কল্কিতে টান দিচ্ছে, ফুৎ ফুঁৎ করছে। আমি দেখছি।

মনাই ফকির, খুব নাম করা ফকির। বিরাট সাধক ছিলেন। গাজীর গান গেয়ে গেয়ে সাধনা করতেন। এতেই সিদ্ধি হয়। ফকির সাহেব (মনাই ফকির) এভাবেই সাধনা করতেন। ১৫০ বছর বয়স। হায় হুতাশ করছে। শিবের দর্শন পাবার জন্য সে কি চিৎকার। সে কি কান্নার রোল। অদ্ভুত একটা দৃশ্য বয়ে গেল। আমার তখন ১২ বছর বয়স। প্রথমে আমি মিটি মিটি হাসছি। মনাই ফকির বলছে আমাকে - তুই তো পেয়ে গেছিস। আমার এখানটা (আজ্ঞাচক্র) খুলে দে।

মনাই ফকির, খুব নাম করা ফকির। বিরাট সাধক ছিলেন। গাজীর গান গেয়ে গেয়ে সাধনা করতেন। এতেই সিদ্ধি হয়। ফকির সাহেব (মনাই ফকির) এভাবেই সাধনা করতেন। ১৫০ বছর বয়স। হায় হুতাশ করছে। শিবের দর্শন পাবার জন্য সে কি চিৎকার। সে কি কান্নার রোল। অদ্ভুত একটা দৃশ্য বয়ে গেল। আমার তখন ১২ বছর বয়স।

তার (মনাই ফকিরের) ওখানে (দ্বিদলে) টিপা (টিপে) দেবার পর ১৫০ বছরের বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। মানাই ফকির শিবের কাছে আকুল হয়ে কাঁদতো আর অন্তরের প্রার্থনা জানাতো। শিবের কাছে সর্বদাই বলতো, ''হে শিব তুমি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছ। হে ভোলনাথ তুমি যদি এত কাছে আছ, আমাকে বুঝিয়ে দাও তোমার উপস্থিতি। তুমি এসে আমার কল্কি প্রসাদ করে দিচ্ছ, তুমি এসে মিঠাই প্রসাদ করে দিচ্ছ। কই, একবারও তো মনাই বলে ডাকলে না।

আমি তোমাকে আল্লাহ্ বলে অভিহিত করেছি, শিব বলে অভিহিত করেছি, ফকির বলে অভিহিত করেছি, তোমাকে সর্বশক্তিমান বলে অভিহিত করেছি। আমি জল, স্থল এক করে ফেলেছি। কই, একবারও তো আস না। আমি হাপুস হুপুস্ করে দিনরাত কাঁদছি। যে শব্দে তুমি নৃত্য করতে করতে ডুগডুগি বাজিয়ে যাচ্ছ, তার তালে তালে মনে হয়, যেন যাই। তবুও তোমাকে পাই না।

আমি বলি, ফকির সাহেব, তুমি এমনভাবে কাঁদছো? ফকির সাহেব, তিনি (শিব) কত ভালবাসেন, জান? আমার চেয়েও তোমার চারপাশে তিনি আসছেন, ঘুরছেন, অনেক বেশী কাজ করছেন। মনাই ফকির বলে, আমি মূর্খ। আমার চাহিদা আমার ত্রুটির জন্য আমিই দায়ী। তিনি যেন তাঁর চাহিদা অনুযায়ী, তাঁর মনের মতন করে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। তুই (আমাকে বলছে) তো শিবকে জানিস্। তুই শিবেরে বলে দিস।

মনাই ফকির বলে, আমি মূর্খ। আমার চাহিদা আমার ত্রুটির জন্য আমিই দায়ী। তিনি যেন তাঁর চাহিদা অনুযায়ী, তাঁর মনের মতন করে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন।

আমি বলি, না, সেটা বলা যাবে না।

এইভাবে মনাই ফকির দিনরাত কাঁদছে। সাধনা করছে। শেষ সময়ে একদিন সুপারী বাগানে সে দেখে, ত্রিশূল হাতে তার সামনে এসে হাজির। শিব বলেন, ''কেন আমায় ডাকছিস্।''

মনাই ফকির বলে, ''আমার চাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তোমার চাহিদা

অনুযায়ী আমাকে গড়ে নিও।" রাত্রে আমার কাছে এসে বলে, সে (শিব) এসেছে। পায়ের ছাপ রেখে গেছে।

দর্শনের মধ্যে যে উপলব্ধি, যারা দেখে নাই, তারা বুঝতে পারে না। বিরাট রূপ সব এই রূপ হতেই আসে, রক্ত, বীর্য হতে যেমন সৃষ্টি হয়। খাদ্যের ভিতর থেকে যদি এই রূপ আসতে পারে, চিন্তাধারা থেকে আর এক রূপ অবশ্যই হতে পারে। সহস্রারে আছে মিলনের সুর; শিবশক্তির মিলন, রাধাকৃষ্ণের মিলন।

সহস্রারে আছে মিলনের সুর; শিবশক্তির মিলন, রাধাকৃষ্ণের মিলন।

সঙ্গম দু'ভাবে হয়। (১) নারী পুরুষের সঙ্গম, এভাবে জাগতিক রূপ হয়, জীবজগতের রূপ হয়। (২) আর এক ভাবে ঊর্ধ্বজগতে সঙ্গম হয়। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের মিলন হয়, শিব শক্তির মিলন হয়।

প্রথমতঃ নারীপুরুষের মিলনে যে সঙ্গম হয়, তাতে সন্তান সৃষ্টি হয়। এই মিলনে সংসারের মায়া, মোহে, আকর্ষণে বিকর্ষণে জড়িয়ে পড়তে হয়। এখানে কেহ কাহাকেও সুখী করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ঊর্ধ্বগতিতে আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারের মিলনে যে সঙ্গম হয়, রাধাকৃষ্ণ, শিবশক্তির সমন্বয়ে যে সঙ্গম হয়, তাতে যে রূপের সৃষ্টি হয়, সেটা হচ্ছে সত্য, শিব, ব্রহ্মজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বিরাট রূপ। এটাও বীর্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়। এতে শক্তির সাথে সহস্রারের সহস্র সূর্যের সাথে শূন্যের সাথে, বিরাটের সাথে মিলন হয়। শূন্যে বহু শক্তি আছে। বিরাটের সাথে মিলনে, তার সঙ্গমে গর্ভ হয়। এতে বাচ্চা হয়। সেই শিশু জ্ঞান শিশু। তাতে বিরাট শক্তির দর্শন হয়। সেই আকারে, বিরাট আমারে দেখা অভ্যাস করতে হয়।

অপরূপ সুন্দরস্বচ্ছতায় ভরপুর বাচ্চা অন্তর্যামিত্বের সুর নিয়ে, এক দেহ নিয়ে এলেন। সেইরূপ ধরেই তিনি সম্মুখে আসেন। সেই শিব কত

সেইরূপ ধরেই তিনি সম্মুখে আসেন। সেই শিব কত অভিজ্ঞতা নিয়ে, কত গভীর ভালবাসা নিয়ে বলেন, হে জীবকুল, তোমরা ভুল বুঝে অন্যদিকে তাকিয়ে আছ। একবারও তো আমার দিকে তাকাও না।

অভিজ্ঞতা নিয়ে, কত গভীর ভালবাসা নিয়ে বলেন, হে জীবকুল, তোমরা ভুল বুঝে অন্যদিকে তাকিয়ে আছ। একবারও তো আমার দিকে তাকাও না। যে প্রেম উন্মাদনায় মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ করে মাতোয়ারা হলেন, সেই প্রেমে চিরদিন তাঁর হাত উপরেই (ঊর্ধ্বাকাশেই) রয়ে গেল। বিষ্ণু (কৃষ্ণ) যখন সামনে এসে হাজির হলেন, একবার বিষ্ণু চান নিমাইকে, একবার নিমাই চান বিষ্ণুকে। সে এক অপরূপ মিলন। এই যে অপরূপ মিলন এখানে আছে অন্তরের চাহিদা, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষর। এই নামে গানে মহাপ্রভু মেতে গেলেন। এই প্রেমের বন্যা, শিবশক্তির বন্যা বিরাট চৈতন্যর বন্যা জগতে রয়ে গেছে, এটাই তিনি (শিব) দেখলেন। রূপ নাই, সাড়া নাই, খোঁজের মাঝে নিখোঁজ। আবার আছে সব। তাই সর্বজীব যাতে ঊর্দ্ধমুখী হয়, ঊদ্ধচিন্তায় ঊর্দ্ধসঙ্গমে রত হয়, প্রকৃতির মাঝে তারই প্রচেষ্টা চলেছে অহোরহ।সূর্য বলছে, প্রতিদিন সূর্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, হে জীবজগৎ, কোন্ আলোকে আলোকিত হয়ে আমি দিনের পর দিন আলো দিচ্ছি? এই আলো আমার নিজের আলো নয়। সমস্ত তেজ কণিকার আলোই আমি দিচ্ছি। শুধু তাকিয়ে দেখ, সমস্ত তেজ কণিকার পুঞ্জীভূত আলোতেই জগৎ আলোকিত হচ্ছে। আমি উদয় থেকে অস্তে চলে যাচ্ছি। এই আলোই বিরাট স্রষ্টার একটিমাত্র চক্ষু। সেই চক্ষুর ইঙ্গিতে আমার আলোক বয়ে যাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখ, সমস্ত তেজ কণিকার পুঞ্জীভূত আলোতেই জগৎ আলোকিত হচ্ছে। আমি উদয় থেকে অস্তে চলে যাচ্ছি। এই আলো বিরাট স্রষ্টার একটিমাত্র চক্ষু।

একটু ডাকলেই যাঁকে পাওয়া যায়, মনাই ফকির পেলেন সেই শিবকে। নিমাই পেলেন বিষ্ণুকে। কেউ আমরা তাঁকে ডাকতে পারছি না। সেই নামে রাম ডুবে গেলেন। রাম নিজে ডুবে গিয়ে দেখেন, তিনি ভগবান। হনুমান বললো, 'প্রভু, আপনিই তো ভগবান।' হনু যখন অনু হয়ে গেল,

যত্র জীব তত্র শিব। যেখানে জীব, সেখানেই শিব। তোমরা মেতে যাও সেই নামে গানে। ডুবে যাও এই বিশ্বের প্রেমে। ডুবে যাও সেই মন্ত্রে। যার যার মন্ত্র, সেটাই হচ্ছে শিব, সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ। এত সুন্দর এত অপরূপ।

দেখলো বিরাট স্রষ্টা কিভাবে রূপ নেন। তাই মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে করে অল্প সাধনায় মৃদঙ্গের সুরে খোলের সুরে তাল দিয়ে জগৎকে নাম দিয়ে গেলেন। যেই রাধা সেই কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ ভাবে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। চারিদিক হতে কত আঘাত প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ করে ধুলায় বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে কৃষ্ণ নামে তন্ময় হয়ে চারিদিকে কৃষ্ণের সাড়া পেয়েছিলেন। এই ভাব কিভাবে আসে? মহাপ্রভু ভাবলেন, 'আমি রাধা হয়ে গেছি।' রাধার ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল হলেন। হা কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ করে কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে গেলেন। এই যে প্রেম এখানে মারামারি কাটাকাটির কোন ব্যাপার নেই। কোন ঝড় ঝাপটা নেই। কোন বিঘ্ন নেই। তিনি চরম গভীরতার সুরে চলে গেলেন। এই প্রেমে আছে চৈতন্য, আছে সর্বজ্ঞতার সুর। একমাত্র শিবের মধ্যেই দর্শনের সব শেষ নয়। মহাপ্রভু দেখলেন; শিব দেখলেন। তাঁরা অনুভব করলেন, আমাদের মধ্যে যা আছে, সকলের মধ্যে তা আছে। তাই বলছে, যত্র জীব তত্র শিব। যেখানে জীব, সেখানেই শিব। তোমরা মেতে যাও সেই নামে গানে। ডুবে যাও এই বিশ্বের প্রেমে। ডুবে যাও সেই মন্ত্রে। যার যার মন্ত্র, সেটাই হচ্ছে শিব, সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ। এত সুন্দর এত অপরূপ। সেই ল্যাংটা কাল হতে আমি চিৎকার করে যাচ্ছি, খুঁজে নাও, বুঝে নাও।

সুভাষ বোস যখন ইম্ফলের কাছে এসে পড়েছে, বলছে, 'তোমরা এস'। তখন ব্রিটিশরা প্রচার করলো জাপানীরা এসে গেছে। ব্রিটিশরা বাঙ্গালী সৈন্যদের সরিয়ে দিল। গুর্খা সৈন্যদের এগিয়ে দিল, তারা তো গুলি করতে ওস্তাদ। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচুর সৈন্য মরলো। যদি তখন বুঝতে পারতো, সুভাষ বোসের ফৌজ এসেছে, বাংলা বা ভারতের এই অবস্থা হোত না। ব্রিটিশরা ফন্দীবাজ। তাদের চিৎকারে বুঝতে পেরেছিল। তাই বাঙ্গালীদের সরিয়ে নিল। ৩০ হাজার সৈন্য মারা গেল।

এইভাবে আমরা অনেক কিছুই হারাচ্ছি। আমাদের ভগবানের ভগবৎ সত্তা কাছেই আছে। তিনি প্রত্যেকের অন্তরে চিৎকার করছেন বলছেন, এসেছি, কিন্তু আমরা কর্ণপাত করছি না। আমিও চিৎকার করছি। তোমার একটু হাত বাড়ালেই খুঁজে পাও। খুঁজে পাওয়াটা সহজ। খুঁজলেই পাবে। সাগর দূরে থাকলে কি হবে, যেখানেই খুঁজে দেখ, অফুরন্ত জল, অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাই পাবে সবাই, একটু সময় সাপেক্ষ।

বড় ব্যথা, বড় দুঃখে দিন যাচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করছে না। বয়সের ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি। আজ একজন দেখা করতে এসেছে ৩৫ বছর পর। এইভাবে সময় নষ্ট করো না। একটু কাজে ডুবে যাও। আমি ঠিকই সাড়া দেব। বয়সের ধাক্কা, বয়সের চাপ মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে। যতই আঘাত আসুক, তুমি নিজের কাজে ডুবে যাও। কোন্ দিন কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে, কিছুই ঠিক নাই। তোমরা যেভাবে পার, কাজ করে যেও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষেতী আছে, ক্ষেত ঠিকই বুনে যাবে। তোমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করে যাও। ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। শুধু চিন্তা করি, কিভাবে সাজানো যায়। এত ভুল বুঝাবুঝি। পিতা পুত্র ঠিক আছে তো। রোজই এই অবস্থা। আমি কি করি, দেখবে না। কি বলি, তাই করবে। যা বলি, সেইভাবেই কাজ করে যেও। তোমাদের জয় হবে। বুঝতে পারবে। তোমরা সব পাবে। শিবও পাবে, বিষ্ণুও পাবে। রাম নারায়ণ রাম।

আমি কি করি, দেখবে না। কি বলি, তাই করবে। যা বলি, সেইভাবেই কাজ করে যেও। তোমাদের জয় হবে। বুঝতে পারবে। তোমরা সব পাবে। শিবও পাবে, বিষ্ণুও পাবে। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ধ্যায়েৎ শূন্যমহর্নিশম্

২৪শে আগষ্ট, ১৯৫৩

তিষ্ঠণ্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভূঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছুন্যমহর্নিশম্।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে।
এতদ্ জ্ঞানং সদা কার্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।।

শয়নে, স্বপনে জাগরণে সর্ব অবস্থায় জপ করবে, জপাৎ সিদ্ধি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মনের চাঞ্চল্যকর অবস্থায়, যে কোন অবস্থায় জপ প্রযোজ্য। সর্বদাই অর্থবোধে জপ করা বিধেয়। জপ সর্বগুণবিশিষ্ট, সর্বদর্শী, সর্বপরিব্যাপ্তমান। সর্বশক্তির সমন্বয়ে যে শক্তি, তাহাই হল জপ। একটি শব্দতে ব্রহ্মান্ডের সব কিছু হচ্ছে। বিরাট চিন্তা একটি শব্দে হচ্ছে। মূলমন্ত্রের, মূলশব্দের জপে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শরীরের সমস্ত অংশগুলি, প্রতিটি অণু পরমাণু ধ্বনি হয়ে বেজে ওঠে। শরীরের তারগুলো ঝঙ্কৃত হয়ে হুঙ্কার শব্দে বেজে ওঠে। সে বাজনায় যে সুর দিচ্ছে, সেই সুর অজানাকে জানায়, অদেখাকে দেখায়, অদৃশ্যকে দৃশ্যে আনে। বহু ব্যাপ্তমান জিনিসকে নিকটে আনে যদি তোমাতে আর মূলমন্ত্রেতে সাধা থাকে একই সুর। এই ঘর ভরতে একমণ সরিষায় কিছু হবে না । কাজেই নির্দিষ্ট একটা সংখ্যায় গেলে তোমার জপের শূন্য স্থান পূর্ণ হবে না। তোমার জপের খালি জায়গা যখন ভরে যাবে, তুমি তখন সবই উপলব্ধি

শরীরের তারগুলো ঝঙ্কৃত হয়ে হুঙ্কার শব্দে বেজে ওঠে। সে বাজনায় যে সুর দিচ্ছে, সেই সুর অজানাকে জানায়, অদেখাকে দেখায়, অদৃশ্যকে দৃশ্যে আনে।

করতে পারবে। বিক্ষিপ্ততা, চঞ্চলতা থাকলেই বুঝবে, পাত্রটি এখনও ভরে নাই। খালি পাত্রটি ভরার জন্যই এই বিক্ষিপ্ততা, চঞ্চলতা। এইগুলি যতক্ষণ রয়েছে, পাত্রটি আরও ভরতে হবে, বুঝতে হবে।

পরিপূর্ণের সাধনাই আমাদের একমাত্র সাধনা। পূর্ণ শূন্যতেই অবস্থিত। একটা শব্দে, মন্ত্রে বিশ্বের সমস্ত কিছু বুঝা যায়। যেমন গভর্ণমেন্ট বললে চৌকিদার থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বুঝা যায়, সেইরূপ সবকিছু নিয়েই মূলমন্ত্র। কত সহজ হয়ে গেল। এক ঘরভর্তি টাকা, সমান একটি মাত্র চেক। তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের চেক হচ্ছে মূলমন্ত্র। এই নিয়েই চলেছ তোমরা যাত্রাপথে।

পরিপূর্ণের সাধনাই আমাদের একমাত্র সাধনা। পূর্ণ শূন্যতেই অবস্থিত। একটা শব্দে, মন্ত্রে বিশ্বের সমস্ত কিছু বুঝা যায়।

কমের পক্ষে এক একজনার ১০০ থেকে ২০০ কোটি জপ জমা দেওয়া দরকার। সময় চলে যাচ্ছে। এই ভাঁটার সময়ে কাজ গুছিয়ে নেওয়া যদি না হয়, তবে সাংঘাতিক অবস্থা। যখনই দেহ রেখে চলে যায়, আত্মা তখন বুঝে কি না, কি আকাম করেছি? ঠিক বন্ধ ঘরের কান্নার মত। শত চেষ্টাতেও আত্মা আর দেহের ভিতর ঢুকতে পারে না। এখানকার গ্রন্থ, সাধনা, জপ অনুযায়ী তার স্থান। কাজেই এর ভিতরই যার যার তল্পি গুছাতে হবে।

কমের পক্ষে এক একজনার ১০০ থেকে ২০০ কোটি জপ জমা দেওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর আসেন তাদের (ভক্ত-শিষ্যদের) দুর্গম পথ সুগম করে দিতে। তখন (অনন্তধামে পৌঁছে) এই কথাও মনে হবে, গুরুদেব এই কথা ঐ ঘরে বলেছিলেন।

যখনই দেহ রেখে চলে যায়, আত্মা তখন বুঝে কি না, কি আকাম করেছি? ঠিক বন্ধ ঘরের কান্নার মত। শত চেষ্টাতেও আত্মা আর দেহের ভিতর ঢুকতে পারে না।

কতকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শত্রু আছে, যারা ভুল বুঝিয়ে দেয়। মায়া,

আদেশ নির্দেশ যে পালন করবে, তারই কাজ হবে। তুমি গন্ধর্ব পুরুষের ন্যায় এগিয়ে যাচ্ছ, আর দেখবে তোমার গুরুদেব আশীর্বাদ করছেন। সম্মুখে দেখবে, বিরাট মহান, সাধকদের থাকবার জায়গা। সেখানে নাই শোক, নাই দুঃখ; আছে শুধু নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা।

মোহ, স্নেহ, মমতা, এইসব থাকা ভালো। তবে সতর্ক থেকো, যেন পিছলিয়ে না যাও। তার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় জপ করা। শরণাগত কিঙ্করের (ভৃত্যের) ভাব রাখতে হবে সদা সর্বদা। গুরুর সান্নিধ্যে নির্দেশ পালন করে এগিয়ে চল। কোন বাধা টিকবে না। কন্টক নিজেও মাথা নত করবে। আদেশ নির্দেশ যে পালন করবে, তারই কাজ হবে। তুমি গন্ধর্ব পুরুষের ন্যায় এগিয়ে যাচ্ছ, আর দেখবে তোমার গুরুদেব আশীর্বাদ করছেন। সম্মুখে দেখবে, বিরাট মহান, সাধকদের থাকবার জায়গা। সেখানে নাই শোক, নাই দুঃখ; আছে শুধু নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা। তখন সব বুঝতে পারবে, সব টের পাবে। তোমাদের নিজেদের উপরই সব নির্ভর করছে। এমনকি তোমাদের জন্ম মৃত্যুও নির্ভর করছে তোমাদের কর্মের উপরে। পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধারের, পঙ্কিলতা থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে জপ ও গুরুর আদেশ নির্দেশ মেনে চলা।

গুরুর কাছ হতে পিছলিয়ে গেলে আজ কাক, কাল পোকা, পরশু ক্রিমি, এই ছকে ঘুরতে হবে। জন্ম-মৃত্যুর এই ছকে যাতে না পড়, সেদিকে হুঁসিয়ার হ'য়ো। বিপথের বন্ধু অনেক, সৎপথের বন্ধু নাই। সেখানে বন্ধু একমাত্র গুরু। গুরুর বাক্য যাতে বক্রভাবে না দেখ, কোনরকম বিভ্রান্তি, ভয়, ভুল যেন না হয় আদেশ পালনে; তারজন্যই গুরুর আদেশ নির্দেশ। সেটি পালন করে কাজ করলে এইসব হবে না।

সংসারের কর্ত্তব্য প্রয়োজনমতো সব করবে। কিন্তু সাথে সাথে তোমার তল্পিও গুছাবে। শ্রীগুরু আজ দেহ নিয়ে এসেছেন কিনা, কাজেই ভুল হয়ে যায়। গুরু তোমাদের আরাধ্য দেবতা, তোমাদের অন্তর্দেবতা। তাঁর সঙ্গে সাধারণ জীবের তুলনা করো না। তিনি হচ্ছেন তোমাদের গতিদাতা। তাঁর দেওয়া

গুরু তোমাদের আরাধ্য দেবতা, তোমাদের অন্তর্দেবতা, তাঁর সঙ্গে সাধারণ জীবের তুলনা করো না। তিনি হচ্ছেন তোমাদের গতিদাতা। তাঁর দেওয়া মূলমন্ত্রকে নিয়ে সবসময় কাজ করবে।

মূলমন্ত্রকে নিয়ে সবসময় কাজ করবে। দেহ নিয়ে এসেছেন বলেই তাঁর এত নির্যাতন? দেশের অকল্যাণ হতে থাকলেই মহাপুরুষের নির্যাতন হয়। গুরু সহায় থাকলে তেত্রিশ কোটি দেবতাও কিছু করতে পারে না।

অবতারদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শনি নেমে আসে। এমনিতে এসে আর তার কি হবে? শনি প্রত্যেকের পিছনেই লেগে আছে। শ্রীগুরুকে যে যত বেশী ভালবাসবে, সে (ভক্ত) তত বেশী নির্যাতনের ভিতর পড়বে। আবার একথা ভুললে চলবে না যে, ভক্তের অধীন শনি। শনি সামান্য একটু বালুকণা। এই কণা চক্ষুতে প্রবেশ করে, সব যাতে ধাঁ ধাঁ না করে দেয়, সে দিক হুঁসিয়ার থাকবে। আর বৃহস্পতি সহায় হলে কোন ভয় নাই।

গুরু কিন্তু শিষ্য যতই বিরূপ হউক না কেন, অচল অটল থাকেন। তিনি ভক্তদের বা শিষ্যদের অসুবিধা হবে, এইরূপ বুঝতে পেরেই আর ঘেঁষতে চান না। তোমরাও সেইরূপ অচল অটল দৃঢ় ও অবিচল থাকবে, যেমনি রয়েছে যুগ যুগ ধরে হিমালয়। আজও হিমালয় 'হরে', 'হরে' করছে। কারণ সেখানে বসেই মহাদেব সাধনা করছেন।

গল্পে আছে একজনাকে তার গুরু লগ্‌গি (লগি) জপ ছিল। 'লগ্‌গি' কিনা 'দশহাত'। জপ করতে করতে 'দশভুজা' (মা দুর্গা) এসে হাজির। পরে তাকে 'চার হাত' জপ দেওয়া হলো। জপ করতে করতে দেখে 'কালী' এসে হাজির। পরে তাকে 'দুই হাত' জপ দেওয়া হলো। দেখে 'কৃষ্ণ' এসে হাজির। তারপর তাকে 'হাত নাই'' জপ দেওয়া হল। দেখে 'জগন্নাথ দেব' এসে হাজির। তারপর 'কিছু না' অর্থাৎ শূন্য জপ দেওয়া হলো। তার (শূন্যের) জপ করতে করতে দেখে সেই যেন সব কিছু। আয়নাতে যে রূপ দর্শান (দেখানো) যায়, তাহাই যেমন দর্শায় (দেখে), সেইরূপ সে সবরূপই দেখতে আরম্ভ করলো। সে তখন বলে, 'আমার আর দরকার নাই। এ যে ভীষণ অবস্থা।' তোমরাও সেরূপ সবাই পূর্ণ। সব রূপেরই প্রতীক তুমি।

সৃষ্টি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বৃহস্পতির অধীনে সব পূর্ণের দল অর্থাৎ

ভক্তবৃন্দ নেমে এলো ধরাধামে। এরা সবাই পূর্ণ। সবাই পূর্ণকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শূন্যধ্যানে কাজ আরম্ভ করলো।

গুরুর বাহ্যিক গতিবিধি বা কার্যকলাপের সমালোচনা করবে না কখনও। বাচ্চা শিশুকে লালন পালন করতে গেলে মাকে বাহ্য প্রস্রাব বা ময়লার মধ্যেই থাকতে হয়। তাই বলে মায়ের পরিচয় এইসব ময়লা বা নোংরা জিনিস নয়। তোমাদের গুরুকেও সেইরূপ বহু অবস্থার সঙ্গে থাকতে হয়, তাল রাখতে হয় দরকারবোধে। আবার গুরুর উদ্দেশ্য উত্তরদিকে গমন হলে তিনি যান দক্ষিণ দিকে। কাজেই তাঁর গতিবিধি দেখে ধারণা করতে যাবে না।

গুরুর বাহ্যিক গতিবিধি বা কার্যকলাপের সমালোচনা করবে না কখনও। বাচ্চা শিশুকে লালন পালন করতে গেলে মাকে বাহ্য প্রস্রাব বা ময়লার মধ্যেই থাকতে হয়। তাই বলে মায়ের পরিচয় এইসব ময়লা বা নোংরা জিনিস নয়।

সবসময় শরণাগত ভাব নিয়ে জপ করবে। আর মনে করবে গুরুদেব যেন এসব কথা আমাকে বলেছেন। যেমন আজ আমি বলছি শুধু, '**ধ্যায়েৎ শূন্যমহর্নিশম্**।' আর 'ধ্যানমূলং গুরোঃ মূর্ত্তিম্ মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্।

তোমরা জপ করে এগিয়ে যাবে। সেই জায়গায় গিয়ে দেখবে, দ্বাররক্ষী রয়েছেন তোমার গুরুরূপী ভাস্করদেব। শুধু এক সূর্য নয়, দুই সূর্য নয়, অনন্ত অনন্ত সূর্য। শুধু সেখানে কেন, যাওয়ার পথে সব জায়গাতেই রয়েছেন তোমাদের গুরুদেব। সেখানে যেয়ে দেখবে, এখানকার এই সব যেন গামলার পোকা।

সময় নেই। যতটুকু অল্প সময় হাতে আছে, পূর্ণ সদ্ ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। সদা সর্বদা শরণাগত ভাব নিয়ে জপ করে যাবে। তবেই তোমাদের সফলতা অবশ্যম্ভবী।

'ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অধ্যাত্মবাদ বাস্তব ছাড়া নয়

পাম এ্যাভিনিউ (২৮/২/৬৫)
(সময় ৬-৪০ মিঃ থেকে ৭-৫৫ মিঃ সন্ধ্যা)

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন আর বাস্তব জীবন একটাই জীবন। যেটা বাস্তব, সেটাই আধ্যাত্মিক। যেটা *আধ্যাত্মিক, সেটা বাস্তব। আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু বাস্তব ছাড়া নয়। বস্তু যেখানে আধ্যাত্মিকতা সেখানে। যত সূক্ষ্মই হোক, অতি সূক্ষ্ম যদি হয়, সবটাই এই বিষয়বস্তু নিয়ে গড়া। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যাকে আমরা প্রাণ বা চৈতন্য বলি, সবটাই আছে এই বিষয়বস্তুতে। এই যে আকাশ, বাতাস, সূর্য সবটার মধ্যে প্রাণ আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। একটা বালুর কণার মধ্যেও প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। সমস্ত বিষয়বস্তুতে একটা সত্তা রয়েছে। অতি সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুতেও এই সত্তা আছে। যেটাকে প্রাণ বলে মনে হয় না, যেটাকে অচৈতন্য বলে মনে হয়, খুঁজে দেখবে এর মধ্যে প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে, সাড়া আছে। এই সমস্ত বস্তুই মধুময়। স্রষ্টা যে নিয়মাবলীর মধ্যে কার্য চালিয়ে আসছেন, তার উদ্দেশ্য রয়েছে, মহান সুর রয়েছে। প্রকৃতির প্রকৃত সত্তা যে চলে আসছে, প্রতি বস্তুর যে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, লয় হয়ে যাচ্ছে, যাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে,

প্রকৃতির প্রকৃত সত্তা যে চলে আসছে, প্রতি বস্তুর যে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, লয় হয়ে যাচ্ছে, যাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে, আজ সেটা ইচ্ছাধীন হচ্ছেনা। ইচ্ছাধীন হলে মনে হয়, তার (প্রকৃতির) উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে।

* দেহম্ অধিকৃত্য ইতি অধ্যাত্মম্।
আধ্যাত্মিকতা দেহ ছাড়া নয়।

আজ সেটা ইচ্ছাধীন হচ্ছে না। ইচ্ছাধীন হলে মনে হয়, তার (প্রকৃতির) উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে।

যে জিনিসের পরিবর্ত্তন হয়, রূপান্তর ঘটে, সেই জিনিস একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছাবে, যখন তার ইচ্ছাধীনে সব চলবে। স্রষ্টা বলেছেন, যেভাবে আমি আমার আমিত্ব বা সত্তা বা বিরাট সত্তা নিয়ে আছি, সেই সত্তা সবার ভিতরেই আছে। সবাই আমারই সত্তার অধিকারে অধিকারী হবে। সেখানে কোন বাধা নেই।

স্রষ্টা যদি একথাই বলেন যে, আমার ইচ্ছাতে গ্রহ, উপগ্রহ, জগৎ; সেই কণাশক্তি আমারই ইচ্ছায়, আমারই ধারায় যদি আমার কাছে এসে পৌঁছায়, তবে আমারই সম্পূর্ণ শক্তির অধিকারে অধিকৃত হবে। যেমন বীজ, গাছ, ফল, বীজ। যে বীজ তা হতে সেই বীজ বার হয়। স্রষ্টা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন এই স্থূলসত্তায়, 'আছি' বস্তুর মধ্যে দিয়ে, 'আছে' বস্তুর মধ্যে দিয়ে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন। আবার নেই, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কে এল? কোত্থেকে এল? খুঁজে পাওয়া যায় না। কে বোঝেন? কোত্থেকে বোঝেন? খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যে 'আছি' আবার নেই, এই যে অবস্থা, বিরাট সত্তা বলছেন, আমি প্রতি বিষয়বস্তুতে আছি। আবার নেই, আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এই শূন্যমার্গে সবাই শূন্য ধ্যানে ব্যস্ত। শূন্যে যখন মন থাকে, শূন্যই যখন জ্ঞান থাকে, তখন সমস্ত বস্তু শূন্যে পরিণত হয়ে যায়।

এই যে শূন্য, এই যে মহাকাশ, মহা ফাঁকা জায়গা, এই শূন্যেই সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ রয়েছে, এই ফাঁকা জায়গার মধ্যেই সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ঘুরছে। অনন্ত মহাশূন্য, এই জায়গার তল নাই। এই ফাঁকার ধ্যানই সবাই করছে। পৃথিবী করছে, সূর্য করছে। মহাশূন্যকে পূর্ণ করার জন্য সবাই ধ্যানে মগ্ন। কাজেই কোন বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে না পাওয়াটাই ধ্যান। ধ্যানের যে পরিসীমা, কি করে খুঁজবো? যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না? কি করে জানবো? যাকে জানা যায় না? ওটাই তার পরিসীমা। এটাই তার

এই যে শূন্য, এই যে মহাকাশ, মহা ফাঁকা জায়গা, এই শূন্যেই সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ রয়েছে, এই ফাঁকা জায়গার মধ্যেই সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ঘুরছে। অনন্ত মহাশূন্য, এই জায়গার তল নাই। এই ফাঁকার ধ্যানই সবাই করছে। পৃথিবী করছে, সূর্য করছে। মহাশূন্যকে পূর্ণ করার জন্য সবাই ধ্যানে মগ্ন। কাজেই কোন বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে না পাওয়াটাই ধ্যান।

অবস্থা। এটাই আমরা বুঝব। সবাই মহাশূন্যে রয়েছে। সেটাই পরিপূর্ণ করছে। সবাই আশা করছে। আশাবিহীন কেউ থাকতে পারে না। সবাই অভাবকে পূরণ করার জন্য, অপূরণকে পূরণ করার সাধনা করছে। সেই অভাবটাই হচ্ছে ফাঁকা। সেই অভাবটাই হচ্ছে শূন্য। এটাই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম ধর্ম। এটাই যোগ ধর্মের প্রধান ধর্ম।

বিশ্বের এই ফাঁকাই হচ্ছে অভাব। এটাকে পরিপূর্ণ করার জন্যই সবাই এগিয়ে চলেছে। প্রতিমুহূর্ত্তে পূরণ করার জন্য সবাই চলেছে। আজও পূরণ হচ্ছে না। আজও সাধনার শেষ হয় নাই। সে জিনিসের সীমানা আজও খুঁজে পাওয়া যায় নাই। কারণ পরিপূরণ হলে তো অসীম থাকে না। তাই বিষয়বস্তু যাকেই খুঁজতে যাও, তাকেই খুঁজে পাবে না। অনন্ত যুগ চলে যাবে, তবুও খুঁজে পাবে না। বস্তুর পর বস্তু আসছে, শেষ আর নেই, শেষ পাবে না। এই বিশ্ব বিরাট, এই জগৎ কোত্থেকে এল? কে সৃষ্টি করলো? সেই দিনটা (সৃষ্টির) খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বস্তু কিভাবে হলো, যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না? খুঁজে যদি পাওয়া যায়, তাহলে সীমানার মধ্যে এসে গেল। সীমানায় পৌঁছলে অসীম আর থাকে না। এরজন্যই অবাঙ্মানসগোচরম্। আবার সবটাই সীমানায়। মুনি ঋষিরা সাধনা করতে করতে খুঁজে বের করলেন। কয়েক লক্ষ বছর সাধনা করেও দেখেন, প্রথম যেখানে বসেছিলেন সেখানেই আছেন। তাই বলছে, 'শেষ নাই'। 'শেষ নাই', এটাই তার পরিচয়। কে সৃষ্টি করলো? ভগবান, যাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁর শেষ নেই। যাঁর কোন শেষ নেই, তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এটা যদি সমাধান হয়ে গেল, তাহলে সে শেষ সীমানার মধ্যে এসে গেল। তাহলে বিরাটও থাকবে না। এই মহাশূন্যে যা কিছু যত খুঁজবে দেখবে, একই জায়গায় রয়েছে। যাঁকে

মুনি ঋষিরা সাধনা করতে করতে খুঁজতে বের করলেন কয়েক লক্ষ বছর সাধনা করেও দেখেন, প্রথম যেখানে বসেছিলেন সেখানেই আছেন। তাই বলছে, 'শেষ নাই'। 'শেষ নাই', এটাই তার পরিচয়।

খুঁজতে গেলে নিখোঁজ হয়ে যায়, তার মানে এই নয় যে, তারজন্য আর ধ্যানধারণার কোন প্রয়োজন নাই। ধ্যানধারণায় যত ডুববে, ততই অসীমের মাঝে চলে যাবে। যার সন্ধান পাওয়া যায় না, তার তলও খুঁজে পাবে না। ধ্যানধারণায় যোগ সাধনায় যত ডোবা যায়, দেখা যায় ওর পরিচয় নেই। এর সমাধান হবে না। এই মহা সমুদ্রের তল বা উপর খুঁজে পাবে না। যার (শূন্যের) উপর নাই, নীচ নাই, এদিক নাই, সেদিক নাই। তার রূপ নাই। রং নাই, গন্ধ নাই, ক্ষণ নাই। আবার সব আছে। রূপটা কি রকম? সবটা আছে, আবার নাই। যার শেষ নাই। তার রূপ নাই, গন্ধ নাই, ক্ষণ নাই। আবার সব আছে। তার মধ্যে আভাষ আছে, চৈতন্য আছে, সব আছে। সাধনা হল সেইখানেই। অতি অপরূপ সেই সাধনা।

মীমাংসার জন্যই সৃষ্টি। যাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না, দেখা যায় না, যিনি সৃষ্টি করছেন, এটাই বিরাট। আবার খুঁজে পাওয়া যায় তাঁকে, আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সমস্ত বিষয়বস্তুতে অবুঝের জন্য, অজ্ঞানতার জন্য, পাপী তাপীর জন্য বুঝা যায় না, তা নয়। যাকে খুঁজি, তাকে বুঝা যায়। যাকে তুমি বুঝছো দর্শনে স্পর্শনে, এই বিষয়বস্তুতে যে উপলব্ধি করতে পারছো, এই বুঝেই সব বুঝ হয়ে যাচ্ছে। যে বুঝ দর্শনে স্পর্শনে পাচ্ছ, সেটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা একটা পেলাম স্রষ্টা রূপহীন। আবার সব রূপেই তিনি আছেন। স্রষ্টা অপরূপ। এই অনন্ত আকাশ নীলাভ যে দেখা যায়, মানে ফাঁকা, মানে শূন্য; এই তার পরিচয়, এই তার রূপ। তার শেষ নেই। অনন্ত গ্রহ, উপগ্রহ আমরা সবাই একমুখী হয়ে সেই নীলাকাশ দেখছি। অসীমের রূপ, স্রষ্টার বর্ণনা, এই মহাশূন্য যাঁর শেষ নাই, যাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁর কথা, তাঁর বর্ণনা করলে তাকে ছোট করা হয়। সেই সুত্রের কথা আছে আমাদের হৃদয়ের যন্ত্রে যন্ত্রে, দেহের শিরা উপশিরায়। যিনি মরে গেছেন, তার গান, তার রেকর্ড যেমন বাঁধা থাকে, তেমনি সেই অনন্তের গান, সেই অসীমের গান, সেই বিরাটের সুর বাঁধা আছে, গাঁথা আছে, আমাদের দেহবীণা যন্ত্রে, মন্ত্রে। সুতরাং সেই কথাটাই

যিনি মরে গেছেন, তার গান, তার রেকর্ড যেমন বাঁধা থাকে, তেমনি সেই অনন্তের গান, সেই অসীমের গান, সেই বিরাটের সুর বাঁধা আছে, গাঁথা আছে, আমাদের দেহবীণা যন্ত্রে, মন্ত্রে।

বলা হচ্ছে, আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের স্পর্শে, প্রকৃতির যোগাযোগ সূত্রে যে সুর বাঁধা আছে, যে বার্ত্তা বহন করে নিয়ে এসেছে, সেই বার্ত্তার কথা এই বাস্তব বস্তুর মধ্যে আছে। তার মধ্যে শুনে নেব শুধু সেইখানকার কথা। সেই বার্ত্তাবহনকারীর বার্ত্তার মধ্য দিয়ে মহাশূন্য আমাদিগকে সজাগ করে দিচ্ছে। সেই মহাস্রষ্টা নিজের দিকে নিজে তাকিয়ে নিজেও খেই হারিয়ে ফেলছেন। ভাবছেন, 'আমি আছি, না নেই।' ভাবছেন 'আছেন'; আবার 'নেই'। তাঁর বার্ত্তাগুলি, তাঁর অন্তরের ইচ্ছাগুলি বহনকারীরা বহন করে এনেছেন আমাদের মধ্য দিয়ে। তাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, তাঁর বার্ত্তাগুলো এসেছে কোন্ কোন্ বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে। আমাদের বুঝে নিতে হবে ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে। তবেই উপকারে আসবে। তবেই বুঝতে পারবো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সেখানকার বার্ত্তা। তাই আমরা বাজাবো এই যন্ত্র আর মন্ত্র। আমরা তানপুরার টানে টান দেব। গভীর সুরে ডুবে সেই বার্ত্তা আর তার সুর জানতে পারবো। আমরা যতটুকু জানতে চাই, স্রষ্টার আগ্রহ আমাদের জানার আগ্রহের অনন্তগুণ।

প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা অভাবের মধ্যে আছি। কারণ বিরাট অভাব হতেই যে সৃষ্টি। আমাদের খাওয়াতে, পরাতে, সবটাতেই অভাব। পূরণ আর হচ্ছে না। আমরা বিরাট অভাবের সাধনা করছি। সেইজন্যই অভাব আমাদের মধ্যে খেলে যাচ্ছে এবং যেদিক দিয়েই হোক, আমরা অভাব মেটাবার চেষ্টা করছি। সেটাই সাধনা। আমরা জিরা, মৌরি, নুন দিয়ে স্বাদ তুলছি। জিরা, মৌরি, নুন, তেজপাতার যখন প্রয়োজন আছে, তখন এই গীতিগান, এই আলোচনা, এই যে 'অভাব আছে,' এসবেরও প্রয়োজন আছে। আমরা সেই অভাবকেই পূরণ করার চেষ্টা করছি। অভাবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অপূরণকে পূরণ করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। প্রকৃতিগত এই যে প্রবহমান ধারা, জন্ম হতে এই যে নিবৃত্তির চেষ্টা, এই নিবৃত্তিই হচ্ছে স্বাভাবিক সহজাত, প্রকৃতির প্রকৃত সত্তা। স্রষ্টা নিজের চিন্তাধারাকেই আমাদের মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নিচ্ছেন। আমরা ভাবছি, আমাদের

প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা অভাবের মধ্যে আছি। কারণ বিরাট অভাব হতেই যে সৃষ্টি। আমাদের খাওয়াতে, পরাতে, সবটাতেই অভাব। পূরণ আর হচ্ছে না। আমরা বিরাট অভাবের সাধনা করছি।

ছেলের টান, বাপের টান, মায়ের টান, ইন্দ্রিয়ের টান, এইসব নানা টানের টানাটানিতেই সবাই ধুমধাম চলছে। সবার ক্ষুধা তৃষ্ণা পূরণ করার তাগিদেই সবাই চলছে। এখানে সন্ন্যাসের জায়গা কোথায়? এটা কি হিমালয়? সব বেটা এমনি ভাবেই মিটাচ্ছে।

ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মেটাচ্ছি, চোখের নেশা মেটাচ্ছি। মায়ের ভালবাসা, স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে থেকে তাদের গড়াচ্ছি। এটা এমন জিনিস যেন ইনসিওরেন্সে টাকা দিয়ে বসে আছি। লাইফ ইনসিওরেন্স, প্রত্যেকেই জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করছে বলে ব্যবসা চলছে। একজনের কাঁধে কত হাজার হাজার টাকা। তারা জানে, ওরা মরবে না। আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা না মিটাতাম, ইন্দ্রিয়ের চাহিদাগুলি না মিটিয়ে চলতে পারতাম, তাতো হয় না। এ এমনই জিনিস, এটাই সাধনা। সেটাতো কেউ বুঝে না। ছেলের টান, বাপের টান, মায়ের টান, ইন্দ্রিয়ের টান, এইসব নানা টানের টানাটানিতেই সবাই ধুমধাম চলছে। সবার ক্ষুধা তৃষ্ণা পূরণ করার তাগিদেই সবাই চলছে। এখানে সন্ন্যাসের জায়গা কোথায়? এটা কি হিমালয়? সব বেটা এমনিভাবেই মিটাচ্ছে। গাড়ী ছুটছে, ট্যাক্সি ছুটছে, সবাই ছুটছে। হৈ হুল্লোড় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রয়েছে। এসব কি এমনি দিয়েছে? চোখ তার ক্ষুধা মিটায়। জিহ্বা বলছে, আমি চাই ছলে বলে আমারটা মিটাতে। কান বলে আমারটা? বড়ার করকরি না হলে মুস্কিল। গন্ধ না হলে আবার হয় না নাসিকার। দাও গরম মশলা। সবটাই ব্যস্ত স্বাদের জন্য। সব বেটার চাহিদাই পূরণ কর। আমরা চোখেরটা মিটাই, জিহ্বারটা মিটাই, চামড়ারটা মিটাই। মিটাতে মিটাতে আমরা চলেছি। আমরা মনে হয় দাসখত লিখাইছি। তারপর রাত দু'টার সময় হিসি, পায়খানা। হইল পেটের অসুখ। তারপর আইল বমি। এটাকে নিয়ে আমরা হুলুস্থুলু করতে আছি। ভূতের কাম না দিলে ঘাড় ভাঙবে। তখন বললো, বেটার দাড়ি সিধা কর। এটাই তোমার কাম (কাজ)। দাড়ি আর সিধা হয় না। স্রষ্টাও আমাদের এমন কামই (কাজ) দিয়েছেন, যার আর শেষ নাই। মিটাইতে মিটাইতে রাগ করে মিটাই, ঝগড়া করে মিটাই, তারপর আবার প্রেম করে মিটাই, বিবাহ করে মিটাই। আবার হাটে যাই, বাজারে যাই, সব মিটাই। এই যে সাধনা, প্রকারান্তরে এক জাতীয় সাধনার কাজই করে যাচ্ছি। অপূরণকে পূরণ করার সাধনা। এগুলো হচ্ছে কতকগুলো কাজ, তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। এই যে নিয়মটা, এই যে নীতি, এটাই হ'ল

স্রষ্টাও আমাদের এমন কামই (কাজ) দিয়েছেন, যার আর শেষ নাই। মিটাইতে মিটাইতে রাগ করে মিটাই, ঝগড়া করে মিটাই, তারপর আবার প্রেম করে মিটাই, বিবাহ করে মিটাই। আবার হাটে যাই, বাজারে যাই, সব মিটাই। এই যে সাধনা, প্রকারান্তরে এক জাতীয় সাধনার কাজই করে যাচ্ছি। অপূরণকে পূরণ করার সাধনা।

প্রকৃতির সত্যিকারের নীতি। প্রকৃতির নীতিই হচ্ছে পরিবর্ত্তন। এই যে পরিবর্তন হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে। আর তাঁর বিরাট কাজ হয়ে যাচ্ছে। আর একটি কথা এই যে, প্রত্যেকেই পাচ্ছে। উপার্জন করছে, টাকা উপায় করছে। প্রত্যেক দেবদেবীর কাছে গিয়ে একটা কিছু চাইছে। মানে পূরণ করতে চায়। একটু শান্তি চায়। সাধনা হচ্ছে। এই কাকগুলো দেখবা কাঠি খুঁজতে খুঁজতে চলছে। ওদের কাঠি খোঁজার কামাই আর নেই। পরিশ্রম করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাম (কাজ) হচ্ছে, আমরা শান্তির বাসা খুঁজতে আছি। খুঁজে আর পাওয়া যায় না। একটু শান্তি পেয়েছে। তারপর কুটা, একজন মরেছে। দেখ, শেষ পর্যন্ত জেলে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা শান্তি চাই। এই যে নাকে শান্তি, চোখে শান্তি, চামড়ায় শান্তি, লোমকূপের শান্তি চাই। এটাই হল পাশের বাড়ীর খাল। এখানকার শান্তি খাওয়ায় পরায়। শনি ঠাকুর, একটু শান্তি দাও। ঐ পাশের বাড়ীর খাল। এটাই পরমানন্দের বেশ। চিদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি বড় বড় কথা যে শোন, তা হল সাগর। আর এই যে ক্ষণিকের শান্তি, এটা হচ্ছে খাল। এখানে খেলনার মত শান্তি চলেছে। শান্তি যেন দৌড়াদৌড়ি করছে।

হা ভগবান, একটু শান্তি দাও। এই শান্তি হচ্ছে বিশ্ববিরাটের বাড়ীর কাছের খাল। তা ধরেই সাগরে পৌঁছান যায়। গড়াইয়া বইয়া লোটাইয়া পোটাইয়া আমরা শান্তি খুঁজছি। এই শান্তি সহজ কথার মধ্যে আছে বলে সহজ কথা নয়। খাল হতে পদ্মা (নদী), পদ্মা হতে সাগর। ওই বাড়ীর খালের উপর দিয়েই আরম্ভ। কাজেই বাড়ীর খালের এত দাম। আমরা সবাই খালের পাড়ে গিয়া বসি নাকে কাপড় দিয়া। এটা হ'ল সেই জায়গা, ক্ষণে তুমি নর্দমা বলতে পার ক্ষণে তুমি খাল বলতে পার; আবার সেই বিরাট সাগর বলতে পার।

হা ভগবান, একটু শান্তি দাও। এই শান্তি হচ্ছে বিশ্ববিরাটের বাড়ীর কাছের খাল। তা ধরেই সাগরে পৌঁছান যায়। গড়াইয়া বইয়া লোটাইয়া পোটাইয়া আমরা শান্তি খুঁজছি।

সবাই আমরা ক্লেদ আর নর্দমা দিয়ে এসেছি। মূলাধার গুহ্যদ্বার আর স্বাধিষ্ঠান হ'ল মূত্রনালী। কাজেই এই দুই জায়গা হ'তে মূলাধারের মুলগ্রন্থির হ'তে যাত্রা হয় শুরু ক্ষণে হয় খাল, ক্ষণে হয় নর্দমা; ক্ষণে হয় মুত, ক্ষণে হয় পুত।

ক্ষণে জল থাকে, ক্ষণে জল থাকে না। দেশে গেছি জল নেই তবু দেখি নৌকা চলছে। এই যা চলেছে, সাধারণ যেটা, এটা হলো বিশ্বের আনন্দের অনুভূতির খাল। নর্দমাও বলতে পার। আমাদের কথা হচ্ছে মূলাধারের নর্দমা না ছাড়াইলে স্বাধিষ্ঠানে আসা যায় না। আবার স্বাধিষ্ঠনের মূলাধার হ'ল হিসির (মূত্রের) জায়গা, জলের জায়গা আবার সৃষ্টির জায়গা। মুত (মূত্র) আর পুত (পুত্র) এক কথা। সবাই আমরা ক্লেদ আর নর্দমা দিয়ে এসেছি। মূলাধার গুহ্যদ্বার আর স্বাধিষ্ঠান হ'ল মূত্রনালী। কাজেই এই দুই জায়গা হ'তে মূলাধারের মুলগ্রন্থি হ'তে যাত্রা হয় শুরু, ক্ষণে হয় খাল, ক্ষণে হয় নর্দমা; ক্ষণে হয় মুত, ক্ষণে হয় পুত। আবার খাল কখনো নালা হয়, চ্যানেল হয়, আবার মহামার্গের পথ হয়। আমরা মার্গ বলি; এই মার্গ দিয়া পায়খানা করে। আবার এই মার্গ হচ্ছে পথ। এই মার্গ দিয়া সহস্রারে স্বর্গদ্বারে যায়। কাজেই এই খালই মহাসুরের নাল। এই নালই হচ্ছে টান। এই টানেই মহাসুরে যাওয়া যায়। এই টানই হচ্ছে ধ্যান জ্ঞান। এই টানই সাধারণ জায়গায় অসাধারণ; সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে। এই দুই টানে মারামারি, যার জন্য

এখানেও দুই টান - আজ্ঞা, সহস্রার। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এই তিনধারায় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শিবের ত্রিনয়ন। এই ত্রিবেণীর সুরটা এখান হতে গিয়ে অর্থাৎ মূলাধার হতে গিয়ে ঐখানে (আজ্ঞাচক্রে) মিলেছে। আজ্ঞাচক্র ত্রিনয়ন।

জেল। আবার এখানেও দুই টান - আজ্ঞা, সহস্রার। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, এই তিনধারায় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শিবের ত্রিনয়ন। এই ত্রিবেণীর সুরটা এখান হতে গিয়ে অর্থাৎ মূলাধার হতে গিয়ে ঐখানে (আজ্ঞাচক্রে) মিলেছে। আজ্ঞাচক্র ত্রিনয়ন। এই ত্রিনয়নের সুরটা প্রত্যেক জীবের এই জায়গায় (দ্বিদলে) আছে। এখানকার ব্যবহার এই মূলাধারের ব্যবহার কে না করছে? যখন বলেছিল, সবচেয়ে স্বাদ কোনটায়? পায়খানা শেষ হলে। পায়খানায় যে শান্তি, এর চেয়ে আর কিছু নেই। আবার কাম উন্মাদনায় নারী পুরুষের যে সঙ্গম, যা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, মারামারি, কাটাকাটি, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, বন্ধু-বিচ্ছেদ, বাপ-বিচ্ছেদ, এটাও উন্মাদনায় চলেছে। আমাকে একবার মূত্রনালীর কেসে ফেলে

দিয়েছিল, এমনি জায়গার জায়গা। এটাও কম জ্বালায় না। কেন জ্বালাবে না? কারণ কি খোরাক দিলা? মূত্রনালীর খোরাক দিলে নূতন আর কত কথা থাকবে? প্রেমটাকে লয়ে রাখবার জন্য কত কিছুর উদ্ভব হয়। প্রথমে কত কথা, তারপর সন্দেহ, তারপরে দুজনে কথা কয় না। দুইদিনের (সাময়িক) এই প্রেমে হলো সময় নষ্ট। আবার যদি প্রেমিকার গোদ হয়, তখন প্রেম কমে যাবে। কারণ সবচেয়ে যারে ভালবাসলাম, তার গোদ হয়েছে। আমাদের দেশে প্রেম আর কোথায় থাকবে? আমাদের দেশে প্রেম চামড়ার; তারপর ঘা গন্ধ। যার জন্য মা হারাইল, বাপ হারাইল, বন্ধু হারাইল। তার 'ই' হতে গন্ধ বের হচ্ছে। গন্ধে আর থাকতে পারে না। সে চললো। ঘরে গিয়া দুঃখ হয়। তারপর আরম্ভ করলো। তারপর তুতো বোনের সঙ্গে প্রেম করতে গেছে। কারণ এর আর শেষ নাই।

আমি ছোটবেলায় ধারে কিনতে গিয়ে দেখি, ''আজ নগদ কাল বাকী।'' পরের দিন দোকানদারকে বলি, 'জিনিস দাও।' ঐ দিনও একই কথা। আজ নগদ কাল বাকী। চিরকালই কাল বাকী। এই যে ক্ষণের পড়ন, ক্ষণেক উঠন, সেই তুতো বোনের গোদ হচ্ছে। কাজেই আর এক বোনকে ধরেছে। কামাই আর নেই। যত স্তুতিবাক্য কর আর না কর, গ্রন্থির খোরাক না দিয়ে উপায় নাই। গ্রন্থির ধাক্কা তোমাদের সামলাতে হবে। যতই উবাচ বলি, প্রায় সকল মহান ব্যক্তি, দেবতা, এই গ্রন্থির প্যাঁচে পড়েছে। পাগলা কুকুরের দিকে কে না তাকায়? তাকানো আবার এমনভাবে কেহ যেন না দেখে, আবার সবাই দেখে। সৎ অসৎ এর প্রশ্ন নেই। এটা হচ্ছে বৃত্তির উন্মাদনার নিবৃত্তি। সুতরাং এটা (সঙ্গম) কি দিচ্ছে? স্রষ্টা বলছে, এতবড় সাগর, তার একটা কণা বা একটা কোষ জলও নয়, এটা ফোঁটা মাত্র। এতবড় সাগরের এক কোষ জলও না, তারজন্যই এত। একটা ফোঁটার ধাক্কা সামলান যায় না। কেন দিয়েছে? ক্ষণেক বাড়ল, ক্ষণেক পড়ল। এই খেলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, সন্ধানে সন্ধানে তোমরা অনুসন্ধান করে যাও। এই তিন গ্রন্থি (ইড়া, পিঙ্গলা,

যত স্তুতিবাক্য কর আর না কর, গ্রন্থির খোরাক না দিয়ে উপায় নাই। গ্রন্থির ধাক্কা তোমাদের সামলাতে হবে। যতই উবাচ বলি, প্রায় সকল মহান ব্যক্তি, দেবতা, এই গ্রন্থির প্যাঁচে পড়েছে।

এই তিন গ্রন্থি (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) হচ্ছে সমস্ত সত্তাকে বাঁধবার জন্য। সমস্ত শিরা উপশিরায় জগৎটা বাঁধা আছে। এটাই হচ্ছে উপবীত। সমস্ত সত্তাকে এই গ্রন্থি বাঁধছে।

সুষুম্না) হচ্ছে সমস্ত সত্তাকে বাঁধবার জন্য। সমস্ত শিরা উপশিরায় জগৎটা বাঁধা আছে। এটাই হচ্ছে উপবীত। সমস্ত সত্তাকে এই গ্রন্থি বাঁধছে। এই গ্রন্থিগুলো এমন ত্রিধারার ত্রিবেণী যে আজ্ঞাচক্রের স্ফূরণের ভিতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অফুরন্ত ভান্ডার ব্রহ্মতালুতে (সহস্রারে) স্ফূরিত হয়। এত জাগ্রত এই বুঝটা ঝিম মেরে কচ্ছপের আকারে থাকে। বাচ্চা যখন গর্ভে থাকে, তোমারই নিজস্ব সত্তা কচ্ছপের আকারে মাতৃগর্ভে থাকে, তেমনি তোমার গর্ভে অনেকগুলো বাচ্চা যোগসূত্রে বাঁধা আছে। তুমি তার কাছে মাতৃশক্তি। এই স্থানে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে উপবিষ্ট হয়ে যোগাসনে অপেক্ষা করছে, কখন সুপ্রসব হবে, কখন ব্যথা হবে, কখন বের হবে সেই অষ্টশক্তি তোমারই সন্তান হিসাবে। সেই অষ্টমুনি তোমার সাহায্যকারী হিসাবে আসবে। এখানে অষ্টজন বসে রয়েছে। তোমারই ব্যথা বেদনার সুরে, তোমার যোগ জপ ধ্যানে বেজে উঠবে তারা। তাই রয়েছে মন্ত্রের সঙ্গে, যন্ত্রের সঙ্গে গাঁথা। তা না হলে সেগুলো নিস্তেজ হয়ে যাবে। জাগাও তোমরা এটাকে।

ইতিহাসের ধারা হচ্ছে, সমস্ত মহানকেই এখানে (কারাগারে) যেতে হয়েছে। ইতিহাসের খাতায় মহানদের কাছে এই কারাগার তীর্থের মতই হবে।

*জেল যখন দিয়েছে, তাদের সম্মান না করে লাভ নেই। আমি হচ্ছি ক্ষেতী। আমি জেলেই যাই আর হাজতে যাই, আমি আমার কাজ করে যাব। আক্রমণাত্মক কথা নয়। আমি কি করেছি, বলার প্রয়োজন মনে করি না। আমি যদি জেলে যাই, তাদের (বলু, বিশু) উপর নির্ভর করেছি বলেই, বিশ্বাস করেছি বলেই যাব।

***বিচারের প্রহসন**

জেল-

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। সারা পৃথিবী দুটো যুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ তখন ঢাকাতে আছেন। একদিন তিনি একটি ফিটন গাড়ীতে চেপে ঢাকার আরমানি টোলায় যাচ্ছিলেন তাঁর এক ভক্তশিষ্যের সঙ্গে তার অসুস্থ পুত্রকে দেখতে। সঙ্গে ছিল আরও দুজন ভক্তশিষ্য রবি ঘোষ ও অন্য একজন। গাড়ী ঢাকা কোর্টের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর রবি ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কিরে'?

জেল যখন দিয়েছে, শাস্তি যখন দিয়েছে, চুপ করে মাথা নত করে শুনে যাব। মনে রাখবে, তোমাদের ঠাকুরের নাম ঘরে ঘরে; চোর বলুক, গুন্ডা বলুক, যে যাই বলুক, শতনাম, সহস্রনাম। এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করা বা প্রতিবাদ

রবি ঘোষ উত্তরে বলে, 'এটা কোর্ট, ঠাকুর।' একটু হেসে শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেন, ''কোর্ট? জানিস রবি, সুভাষ বোসের ব্যাপারে নানারকম মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পুলিশ অনেকবার আমাকে কোর্টে হাজির করাবে।''

শিষ্য তিনজনই উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কবে ঠাকুর কবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বলেন, ''সময়মতো দেখতেই পাবি।''

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই রহস্যময় হাসির উত্তর মিললো যথাসময়ে। সেই সময়মতো দেখার তারিখটি হলো ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর। সেইদিন এই জন্মসিদ্ধ মহানকে এক মিথ্যা মামলার আসামী সাজিয়ে গ্রেপ্তার করা হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আরও ৫০ জন ভক্তশিষ্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যায় লালবাজারে। তদন্তের নামে এই ভক্তশিষ্যদের উপরে 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' অর্থাৎ চরম শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়। শুধু একটিমাত্র কথাই জানার জন্য, সেটা হল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের খবর।

অবশেষে কয়েকদিন পর কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না পেয়ে সুযোগ্য চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে পারেন যে, মামলাটা সর্বৈব মিথ্যা এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। পুলিশের কারসাজি তিনি সবই ধরতে পারেন। তাই পরবর্ত্তী তারিখে তিনি সকলকেই বেকসুর মুক্তি দেন।

অবশ্য পুলিশ এখানেই থেমে যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে এক রমণীকে শিখন্ডী দাঁড় করিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক জঘন্য মামলার সূচনা করে। দীর্ঘ একবছর ধরে আলিপুর কোর্টে এই মামলা চলে। অবশেষে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট দীর্ঘ শুনানীর পর ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজকে সসম্মানে মুক্তি দেন এবং রায়ে মন্তব্য করেন, "The story rings wholly untrue and appears to be false on the face of it".

এই জন্মসিদ্ধ মহানকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বারেবারেই চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে বিধবার সম্পত্তি অপহরণের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। কি সম্পত্তি? টালিগঞ্জ, বাঁশদ্রোনীর মত জায়গায় কয়েক কাঠা জমি, যার আর্থিক মূল্য সেই সময়ে কাঠা প্রতি অতি সামান্য টাকা। সেই সামান্য কয়েক কাঠা জমি তিনি প্রতারণা করতে যাবেন? যাঁর শিষ্য সংখ্যা সেই সময়ে ৬০ লক্ষের উপরে। প্রত্যেক শিষ্যের কাছ থেকে মাসে ১টি করে পয়সা নিলে, যাঁর মাসিক আয় হয় ৬০ হাজার টাকা। তিনি ঐ সামান্য জমি আত্মসাৎ করেছেন, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বাড়ীতে সিঁড়ি থাকতে কেউ কি পাইপ বেয়ে উপরের তলায় ওঠে? অর্থ উপার্জনের এমন সহজ উপায় থাকতে তিনি বিধবার সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে যাবেন কেন? কোন শিষ্যের কাছ থেকে ধর্মের নামে ১টি পয়সাও তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সততার কোন মূল্যই তিনি পেলেন না। ব্যাঙ্কশালের অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচারের নামে প্রহসন হল।

করার কথা নেই। নদীর এপাড় ভাঙ্গে, আবার ওপাড় গড়ে। আবহমানকাল হতে এই ধারাই চলে আসছে। আমিও এই ভাঙ্গাগড়ার মাঝখান দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। এত লক্ষ লক্ষ লোক তৈরী করেছি, আবার চলে গেছে। ইতিহাসের ধারা হচ্ছে, সমস্ত মহানকেই এখানে (কারাগারে) যেতে হয়েছে। ইতিহাসের খাতায় মহানদের কাছে এই কারাগার তীর্থের মতই হবে। আমি তাদেরকে (বলু, বিশু ও তাদের পরিবারকে) বুকের উপর নিয়ে মানুষ করেছি, ভালবেসেছি, অন্তর দিয়ে নির্ভর করেছি তাদের উপর। যাই করেছি, এই বলেছি 'আমাকে ফাঁসাসনি।'

ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বিরুদ্ধে কোনরকম প্রমাণ বা সাক্ষীসাবুদ না থাকা সত্ত্বেও এবং আইনের কোন সঠিক ধারায় ফেলতে না পেরে স্যার জন উড্‌রফ নামে এক কুখ্যাত ইংরেজ সাহেবের লেখা বইয়ে ভারতের সাধুসম্প্রদায় সম্বন্ধে এক জঘন্য মন্তব্যের উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। তাঁর একবছরের জেল ও দুই হাজার টাকার জরিমানা ধার্য করা হয়। (কিন্তু বাস্তবে কার্যকরী হয়নি।)

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের শাস্তিদানের বিরুদ্ধে ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তরফ থেকে হাইকোর্টে আপীল করা হয় সুবিচারের জন্য। হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চে এই মামলার শুনানী হয়। তারপর বিচারপতিদ্বয় একমত হয়ে দীর্ঘ একশো পৃষ্ঠার যে রায় দেন, তা থেকে কিছু কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হল। এর থেকে মামলার পিছনের ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশা করি, সকলেই কিছু না কিছু জানতে পারবেন।

(১) ফৌজদারী কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের কোন এক্তিয়ারই নেই এই মামলার বিচার করার। বিশেষ করে বিবাদী (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) যখন দাবী করেছেন, জমি তাঁর নিজস্ব।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট (ব্যাঙ্কশাল কোর্ট) বেনামীর মূলসূত্রগুলির একটির উপরও কোন চিন্তা না করে অযোগ্য, অনুপযুক্ত, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, বিবাদী (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) বিধবা শৈলবালার ট্রাষ্টি এবং এজেন্ট। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে স্পষ্টভাবে অন্যায় করেছেন।

(৩) বিধবা শৈলবালার কাহিনী সর্বৈব মিথ্যা। প্রভিডেন্ট ফান্ড, লাইফ ইনসিওরেন্সের অত টাকা স্বামীর অবর্ত্তমানে উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ছাড়া দেয় না। বিধবা শৈলবালা তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট সে নেয়নি। শৈলবালার সাক্ষ্যতে একথাও স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সে অতি দরিদ্র ছিল। সুতরাং শৈলবালার সাক্ষ্য থেকে আমরা নিশ্চিত জানতে পারছি যে, রহমানের জমি কিনবার মতো ৩৭,০০০ টাকা জোগাড় করার কোন সঙ্গতি শৈলবালার ছিল না।

(৪) একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, অমরেন্দ্র, তার ভাই-বোনেরা এবং মা শৈলবালা ১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চের আগে কলকাতায় আসেনি। তার আগেই রহমানের কাছ থেকে বিবাদীর (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) জমি কেনা ও চুক্তিসম্পাদন হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে শৈলবালা ও তার ছেলেদের কোনপ্রকার সম্বন্ধই থাকতে পারে না। জমিগুলি বিবাদী (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) রহমানের কাছ থেকে সাফ কোবালায় নিজে কিনেছেন। সুতরাং বেনামী লেনদেনের প্রশ্ন ওঠে না।

আমি গুরুগিরি করে কারও নিকট হতে টাকা পয়সা নেই না। কারও নিকট হতে চেয়ে আমি অর্থ নেই না। সস্তাজ্ঞানে যা করেছ, তোমরা নিজেরা করেছ। তাদেরকে (বলু, বিশুকে) আরও ৮০ হাজার টাকার জমি দিয়েছি। তার ফল এই? পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপিয়ে দিয়েছে? চোর বলুক আর যাই বলুক, তোমার তো ঠাকুর। আমি কাজ করে যাব। অন্যদিকে তাকাবার সময় নেই। জগতের শান্তি চাই। আর যারা জগতের শত্রু, তাদের ধ্বংস হবে। তার মাধ্যমে আমি একটা রোল আর রোলার চালিয়ে যাব। আমি কাউকে হিংসা করি নাই। বহু কথা, বহু দুর্নাম নিয়েছি। আজও তা চলেছে। আমি প্রলোভনের বশে আমার আধ্যাত্মিক শক্তির যেন ব্যবহার না করি। আর তোমাদের যেন সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে গেলে কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না।

আর যারা জগতের শত্রু, তাদের ধ্বংস হবে। তার মাধ্যমে আমি একটা রোল আর রোলার চালিয়ে যাব। আমি কাউকে হিংসা করি নাই। বহু কথা, বহু দুর্নাম নিয়েছি। আজও তা চলেছে। আমি প্রলোভনের বশে আমার আধ্যাত্মিক শক্তির যেন ব্যবহার না করি। আর তোমাদের যেন সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে গেলে কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না।

(৫) রহমানের দেওয়া তথাকথিত ৩৭,০০০ টাকার রসিদ যদি সত্যি হয়, তবে মূল দলিলগুলির মোট খরিদ টাকার অঙ্ক ৩৮,৫০০ টাকা মিথ্যা হয়ে যায়। সুতরাং দলিলগুলি বাদী (বিধবা শৈলবালার) পক্ষের মৌখিক সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রমান করছে।

(৬) বাদী (বিধবা শৈলবালার) পক্ষের কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেসব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কথা আগে বলা হয়েছে, তাদের বাদীপক্ষ কোর্টে সাক্ষ্য দিতে হাজির করতে না পারায়, বাদী (শৈলবালার) পক্ষের বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং আসামী পক্ষের কাহিনীই যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নির্বিবাদে এই সিদ্ধাতে উপনীত হওয়া যায় যে, বাদী (বিধবা শৈলবালার) পক্ষ কোন কুটিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে রহমান ও অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য আইনসঙ্গত পথ নেয়নি।

(৭) যেভাবে বিবাদীর (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) মূল দলিলগুলি বিধবা শৈলবালার হস্তগত হল, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শৈলবালার ছেলেরা ঐ দলিলগুলি বিবাদীর জিম্মা থেকে চুরি করে এনেছে।প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শৈলবালার ছেলেদের উপর বিবাদীর (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) অতীব বিশ্বাস ছিল।

(৮) যেসব সাক্ষ্য প্রমান আমরা পরীক্ষা করেছি, তাতে বিবাদীর (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) ''না দাবী'' দলিলে স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ জাগায়। এবং প্রমাণ করে যে, স্বীকারোক্তিগুলি বস্তুতঃ সত্য নয়। কারণ বাদী (বিধবা শৈলবালার) পক্ষ ১০ সিরিজের মূল দলিল গুলির বেনামী লেনদেন সম্পর্কে কোন প্রমাণ দিতে পারেনি।

যেখানে গেলে কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। মনে প্রাণে যে ভার নিয়েছি তোমাদের, তা যেন লাঘব করতে পারি। একা একা চোখের জল ফেলি। বাচ্চা বয়স হ'তে ঠাকুর হয়েছি বলে চোখের জল পড়ছে। মা কাঁদছে, আমিও কাঁদি। অন্ধকারের মধ্যে একা একা বসে থাকি। বুঝি চারিদিক হতে কান্নার আঘাত প্রতিঘাত এসে আমার মধ্যে বাড়ি খাচ্ছে। মনে হয়, দিই একটা ফোঁস করে। কিন্তু না। তাহলে তো যে কাজের জন্য এসেছি, সেই আসল কাজ করা হবে না। কত লোককে বাঁচিয়েছি, ফাঁস হতে বাঁচিয়েছি। এর চেয়ে হাজারগুণ বেশী, আমার কাছে কিছুই না। কিন্তু নিজের জন্য কিছু করার ক্ষেত্রে আমার হাত-পা বাঁধা। টাইটানিক জাহাজ ডুবছে। ক্যাপ্টেন সকলকে বাঁচিয়ে নিজেকে কেবিনে বন্ধ করে সাগরের জলে চাবি ফেলে দিল।

আমার চাবি আমার কাছে। আমার দৈবশক্তিতে যখনই হাত দিতে যাই, ভিতর থেকে আরে ধ্যাৎ ধ্যাৎ করছে। একটা রেকর্ডের মধ্যে ক্র্যাক্ পড়লে একটা কথাই বলে। এতে যদি আমার শিষ্যরা আমাকে ছেড়েও যায়, আমি লাইনচ্যুত হবো না। আমি যদি দুটো লোকও নিয়ে যেতে পারি, তাহলেও বুঝবো, বাপ ব্যাটা ঠিক আছে। আমি যেভাবে নেমেছি, সেভাবে তোমরা যদি নাম, তাহলে বুঝতে পারবে। ৬০/৬৫/৭০/৮০ বছরের খেলা এখানে। চিরকাল যদি এখানে থাকতে পারতে, তাহলে না হয় কথা ছিল।

(৯) লোয়ার কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচারের সমর্থনে স্যার জন উড্‌রফের লেখা তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত বইয়ে সাধুসন্তদের সম্পর্কে যে কটূক্তি আছে, তার উদ্ধৃতি দিয়ে সঙ্গত কাজ করেনি। যেহেতু আমরা তার শাস্তিবিধানকে অবৈধ ঘোষণা করছি, অতএব তার রায়ের যে অংশে উক্ত কটূক্তির উদ্ধৃতি আছে, তা রেকর্ড বহির্ভূত বলে গ্রাহ্য হবে।

পরিশেষে আমরা ঘোষণা করছি, বাদী (বিধবা শৈলবালা) পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং লোয়ার কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত রায় আমরা বাতিল করলাম এবং আসামীর বিরুদ্ধে তার শাস্তিবিধান অবৈধ বলে ধার্য করলাম। আসামীকেও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলাম।

এরপরের অধ্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট। হাইকোর্টে হেরে যাবার পর সরকারপক্ষ সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলো। সেখানেও সত্যের জয় হল। গত ২৭ শে নভেম্বর, ১৯৭৩ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের আপীল অগ্রাহ্য করে হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রেখে বলেছেন, সবদিক বিচার করে আমরা বিবাদী (ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) নির্দোষ এই মর্মে বাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপীল নাকচ করলাম।

আমার চাবি আমার কাছে। আমার দৈবশক্তিতে যখনই হাত দিতে যাই, ভিতর থেকে আরে ধ্যাৎ ধ্যাৎ করছে। একটা রেকর্ডের মধ্যে ক্র্যাক্ পড়লে একটা কথাই বলে। এতে যদি আমার শিষ্যরা আমাকে ছেড়েও যায়, আমি লাইনচ্যুত হবো না। আমি যদি দুটো লোকও নিয়ে যেতে পারি, তাহলেও বুঝবো, বাপ ব্যাটা ঠিক আছে।

৬০/৬৫ বছরের খেলার মধ্যে এখানকার চাহিদা মিটিয়ে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করে চির কল্যাণের পথ, চিরতরে সাধনার পথ আমি 'নাই' করতে চাই না। তোমাদের বাপ যদি জেলে যায়, জেলে গিয়ে যদি জানালা দিয়ে দেখ, তবুও ভাল। তবুও যেন আমি আমার শক্তির অপব্যবহার না করি। তবুও যেন আমায় হীরক খচিত আসনে দেখতে চেও না। সেটাই হল বড় সাধনা। আমায় দেখে তোমরা যদি চোখের জল ফেলে আস, তাও ভাল। বলবে, আমার বাবা ন্যায় নীতির জন্য জেলে এসেছেন। মহান চরিত্রদের চরিত্র এখানে স্লিপ করে। অনেক মহান আছেন, যাঁরা এখানে সাধনা করে বড় হয়েছেন। আবার অনেকে আছেন যাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তোমাদের ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেই মায়ের পেট থেকে এসেছেন। তাই তাঁর এই অবস্থা। এই ক্ষমতাগুলো থাকতেও তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এইজন্যই তোমাদের ছিদ্যৎ। এখানে সাধনা করে বড় হলে ২/৪ টা ধাক্কা দিতে পারতাম। কিন্তু অভাগা তোমরা।

একদিকে নির্যাতিত। আর একদিকে কিন্তু তোমরা অভাগা নও।

মহান চরিত্রদের চরিত্র এখানে স্লিপ করে। অনেক মহান আছেন, যাঁরা এখানে সাধনা করে বড় হয়েছেন। আবার অনেকে আছেন যাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

ঠাকুর তোমাদের উপর বাটপাড়ি করেননি। আমি কিছু চাইবো না, এটা দাও, ওটা দাও। হাইকোর্টে অনেক টাকা লাগে। এটুকু চাওয়া আছে তোমাদের নিকট। তোমরা সন্তান একটু দেখো। তোমাদের ঠাকুর কোন নেশা করেন না। এককাপ চা-ও কোনদিন খান নাই। আমি যেন কাজ করতে পারি। বাপতো। বাপকে না দেখলে কে দেখবে। সাধুগুরুরা এইজন্য অনেকেই এক জায়গায় থাকেন না। আমার এখন এক জায়গায় বসে থাকতেই ইচ্ছা করে। এইজন্যই আমার উপর দিয়ে চলছে জাঁতা। আমি এক জায়গায়ই থাকবো। তোমরা দেখো।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সৃষ্টিরহস্য

বালিগঞ্জ

(১০-০২-১৯৬৭)

আজ তো আলাপ করার কোন কথা ছিল না। ওরা হঠাৎ এসে পড়েছে। কিছু জানতে চেয়েছে, তাই কিছু বলছি। মন দিয়ে শুনে ভিতরে গাঁথতে চেষ্টা করবে। আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগের কথা বলছি। আমি ঐ সময় মাঝে মাঝে পাহাড়ের দিকে চলে যেতাম। গ্যাংটক ছাড়িয়ে লঙ পাহাড় আছে। আরও ভিতরে তিব্বতের দিকে চলে যেতাম। সেখানে খুব বড় বড় কিছু সাধক আছেন। তারা আমাকে আপন করে নিয়েছিল। তাদের কারুর বয়স দেড়শো, কারুর দুইশো, কারুর আরও বেশী। তোমাদের শুনে অবাক লাগছে। তারা সবসময় শাস্ত্রচর্চা ও ধ্যান জপ নিয়ে থাকে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সবসময় চিন্তা ভাবনা করে। তাদের কাছে খবর গেছে একজন জন্মগত বাচ্চা এসেছে। তাই আমাকে ভালবেসে ধরে নিয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের দিকে চলে যেতাম। গ্যাংটক ছাড়িয়ে লঙ পাহাড় আছে। আরও ভিতরে তিব্বতের দিকে চলে যেতাম। সেখানে খুব বড় বড় কিছু সাধক আছেন। তারা আমাকে আপন করে নিয়েছিল। তাদের কারুর বয়স দেড়শো, কারুর দুইশো, কারুর আরও বেশী।

যেটা সাধনা করে লাভ করতে হয়, সেটা আমার মধ্যে জন্ম থেকেই সহজভাবে ফুটে ছিল। তাই তারা আমাকে নিয়ে গেছে কিছু শুনবে বলে। সেখানে বাইরের লোক কাউকে ঢুকতে দেয় না। ওরা ওদের মধ্যে আপনমনে

আমার গলায় একজন বৃদ্ধ মালা পরিয়ে দিয়ে বললো, ''আমার বয়স কতো, আমি নিজেও ঠিক জানি না। ২০০ বছর পর্যন্ত হিসাব ছিল। তারপর আর খেয়াল নেই।

বিশ্বরহস্যের চিন্তায় সদা সর্বদা ডুবে থাকে। তাদের ভিতর এমন একটা প্রাণের সংস্পর্শ আছে, যেটা এখানে কম দেখা যায়। কোন ছোট বড় তারা দেখে না। জ্ঞানের কাছে সবাই মাথা নত করতে জানে। আমাকে নিয়ে খুব আপ্যায়ন করে বসালো একটা বড় পাথরের উপর। সবাই আমাকে ঘিরে বসেছে। আমার গলায় একজন বৃদ্ধ মালা পরিয়ে দিয়ে বললো, ''আমার বয়স কতো, আমি নিজেও ঠিক জানি না। ২০০ বছর পর্যন্ত হিসাব ছিল। তারপর আর খেয়াল নেই। এতদিন ধরে আমি সাধনা করে চলেছি। কিন্তু এই বাচ্চার মতো এরকম কাউকে দেখিনি।'' আমার তখন ১২/১৩ বছর বয়স হবে। সভার মধ্যে একজন বললো, ''আমাদের বয়সের কাছে তুমি শিশু বললেও অনেক। আমরা শুনেছি, তোমার কোন গুরু নেই। যে বয়সে মানুষ শিষ্যও হতে পারে না, সে বয়স থেকেই তুমি গুরু। তাই তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনার বয়স কত?'' তিনি তখন বললেন, ''১২০/১২৫ হবে।'' এই সময় সেই বৃদ্ধ যার বয়স ২০০-রও বেশী, তিনি দেখি মুচকি মুচকি হাসছেন। আমি তো ভাবছি আমার প্রশ্ন করাতে কোন ভুল হয়েছে কি না। কারণ তাদের রীতি নীতি সম্বন্ধে আমার ঐসময় বিশেষ ধারণা ছিল না। একটু সংকুচিত হয়ে আছি। তখন ঐ বৃদ্ধ যিনি আমাকে প্রশ্নের কথা বলছেন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই বাচ্চাকে দেখে তোমার বুঝা উচিত যে, এ একেবারেই আমাদের মতো নয়। তুমি তোমার যে প্রশ্ন করবে, তা তোমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকেই করবে। তার বাইরে তুমি যেতে পারবে না। কিন্তু সেই প্রশ্নের সমাধান হলেই যে তোমার সব জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাবে, তাতো নয়। আমাদের যা বুঝ, এই শিশুর বুঝ যে তার থেকে অনেক এগিয়ে এইটুকু তো বুঝতে পারছো। তাই আমরা বরং তাঁর উপরই ছেড়ে দিই আমাদের প্রশ্নটাও। তিনিই জানেন,

আমাদের যা বুঝ, এই শিশুর বুঝ যে তার থেকে অনেক এগিয়ে এইটুকু তো বুঝতে পারছো। তাই আমরা বরং তাঁর উপরই ছেড়ে দিই আমাদের প্রশ্নটাও। তিনিই জানেন, আমাদের কি জানা উচিত। আর কি জানলে আমরা সঠিক পথের সন্ধান পাবো।

আমাদের কি জানা উচিত। আর কি জানলে আমরা সঠিক পথের সন্ধান পাবো। তাই হে বাচ্চা! জাগতিক বয়সে তুমি আমার থেকে অনেকটাই ছোট। কিন্তু তোমার ঐ মায়াভরা চোখদুটি দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি সবই জানো। তাই আমাদের সব প্রশ্ন তোমার কাছেই রেখে দিলাম।" বৃদ্ধের এই প্রাণঢালা কথা শুনে আমার দুচোখ জলে ভরে গেল। ঐসময় দেখি, আগের যিনি প্রশ্নকর্তা (যাঁর ১২০/১২৫ বছর বয়স) তিনি উঠে আমার কাছে ও সেই বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

আমি বললাম, তোমাদের ভালবাসা আমার চোখে জল এনে দিয়েছে। যে ইচ্ছাশক্তির থেকে এই জগৎ সৃষ্টি, সে চায় শুধু আকুলতা ভরা ডাক। সংসারিক জীবনে মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী পুত্রের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা সেই ডাকের পরিচয়ের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। খুঁজতে গেলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কে দেখে, কে শোনে, কে খায়, কে স্বাদ পায়, কে বোঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের চিন্তা যে একটা রূপ নেবে, ধ্যানে যে একটা রূপ নিতে পারে, তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ হলো এই জীবজগৎ। কিন্তু এই রূপটাই তো প্রথম থেকে ছিল না। তারও আগে অন্য রূপ ছিল। চিন্তা করে দেখ তো, জগতে যে অদ্ভুত নানারূপ, এই রূপ কোথা থেকে এল? কে করলো? কোথা থেকে করলো? কে সৃষ্টি করলো? কিভাবে সৃষ্টি করলো? ভগবান যদি বলি, তবে প্রশ্ন আসে ভগবানকে কে সৃষ্টি করলো? বিজ্ঞানীরা energy and matter-এর কথা বলে। কিন্তু সেটাই বা কিভাবে আসলো? একটা ঘর সাজাতে গেলেও কাউকে না কাউকে সাজাতে হয়। এখানে টেবিল এখানে চেয়ার নিজেদের সুবিধামতো আমরা সাজিয়ে সাজিয়ে রাখি। এই বিশ্বজগতের এই setting-টা, এই সাজানোটা, এই পাহাড় সাগর চন্দ্র সূর্য কে সাজালো? একটা পুকুর কাটতেও তো কতো লোক লাগে। আর এত বড় সাগরটা কে কাটলো? তোমরা সহজে পেয়ে যাচ্ছ বলে গুরুত্ব দিচ্ছ না। এই কারিকুরি, এই তুলির টান কে দিল? কে করলো? কিভাবে এল? সবগুলি গভীরভাবে দেখলে কি মনে হয় না যে, কে যেন বসে বসে বুদ্ধির কারিকুরি করে গেছে। প্রথম থেকেই তো

কে সৃষ্টি করলো? কিভাবে সৃষ্টি করলো? ভগবান যদি বলি, তবে প্রশ্ন আসে ভগবানকে কে সৃষ্টি করলো? বিজ্ঞানীরা energy and matter-এর কথা বলে। কিন্তু সেটাই বা কিভাবে আসলো?

পৃথিবীর বুকে আজকের মতো মানুষ বা জীবজগৎ ছিল না। এই পৃথিবী দশ হাজার বছর আগে একরকম ছিল, বিশ হাজার বছর আগে আরেক রকম ছিল। যিনি আঁকবেন, তুলির টানটা তো সেইরকমই হতে থাকবে। এই যে বিভিন্ন রূপ কিভাবে এল? যিনি সৃষ্টি করেছেন, কেন করেছেন? কিভাবে করেছেন? কেন কেন করে কেনর আর সমাধান হয় না। কিন্তু সমাধান নিশ্চয়ই আছে। সৃষ্টি যখন হয়েছে, তখন সমাধানে আসবে। বিষয়বস্তু কঠিন হলেও সহজ কথায় জানিয়ে দিচ্ছি। ভগবান আছে কি না, তা জানার প্রয়োজন নেই। এই কথাটা মনে রেখো, এই মহাকাশে যেখানে কোনকিছু নেই, একটা ফাঁকা জায়গায় যখন কোন কথা আসে, তখনই কিছু থাকবে। যখনই বলছো ফাঁকা, তখনই বুঝতে হবে, কিছুর উপর দাঁড়িয়েই এই ফাঁকা কথাটা বলছো। তখনই আঁকা হয়ে যাবে। পৃথিবী যদি না থাকতো, জীবজগৎ যদি না থাকতো, তাহলে এই প্রশ্ন উঠতো না। তুমি আছ বলেই এই প্রশ্ন করতে পারছো। যখনই ব্যাখ্যা আছে, তখনই বুঝতে হবে সবই আছে। ফাঁকা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত, আঁকাও সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে ফাঁকাটাই কি কেবল আছে? এই যে শূন্যে ফাঁকা জায়গার মধ্যে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ পৃথিবী বলের মতো ঘুরছে, তার মধ্যে আবার গাছপালা, পাহাড়, সাগর এসবই বা কেন? এই যে সাজানো চুল নাক চোখ মুখ - এইগুলো কোথা থেকে এল? এগুলো যদি ধরে নিই ভগবান করেছে, তাহলে সাথে সাথে প্রশ্ন আসে ভগবানকেই বা কে করলো? ভগবান বলে যে ব্যাপারটা, সেটাও কি তাহলে চোখ মুখ নাকের মত আপনা আপনি গজিয়েছে?

এই মহাকাশে যেখানে কোনকিছু নেই, একটা ফাঁকা জায়গায় যখন কোন কথা আসে, তখনই কিছু থাকবে। যখনই বলছো ফাঁকা, তখনই বুঝতে হবে, কিছুর উপর দাঁড়িয়েই এই ফাঁকা কথাটা বলছো।

একজন হাট থেকে একটা নারকেল এনে খাটের তলায় রেখেছিল। কিছুদিন পরে দেখে আপনাআপনি সেই নারকেলটা থেকে গাছ গজিয়েছে। এই যে মেঘ দেখছো, শূন্যে ঘুরছে। পৃথিবী,গ্রহ, উপগ্রহ, সবাই শূন্যে ঘুরছে। সবাই এমন একটি

একজন হাট থেকে একটা নারকেল এনে খাটের তলায় রেখেছিল। কিছুদিন পরে দেখে আপনাআপনি সেই নারকেলটা থেকে গাছ গজিয়েছে।

জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে যার কোন পরিচয় নেই। পরিচয় বিহীনের কাছে সবাই আশ্রয় নিয়েছে। শূন্য এমন একটি স্থান, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। আবার তার কাছেই গ্রহ, নক্ষত্র সকল কিছু আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয় যখন কেউ নেয়, তখনই বুঝতে হবে স্বস্তিতে না থাকলে, এতদিন ধরে আশ্রিত হয়ে থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই সবাই শূন্যের কাছে আশ্রয় পেয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। আমাদের এখানে কয়েকটা গাড়ি চলে, তাতেই কত accident. আর মহাশূন্যের জগতে অনন্ত কোটি সৃষ্টবস্তু গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য- কই সেখানে তো accdient ঘটছে না। কি সুন্দর সব মেশিনের মত ঠিক ঠিক চলছে। কে এইভাবে নিখুঁত গণিতের নিয়মে সবকিছু সাজালো? কে সাজিয়েছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই না পাওয়ার ইঙ্গিত, এই ফাঁকার ইঙ্গিত, আমাদের জীবনের প্রতিটি ধারায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুপরে খেয়ে আবার রাত্রে খেতে হচ্ছে। এতটুকুই পূরণ করতে পারছো না। যখন পেট ভরে খেলে, মনে হয় জীবনে বুঝি আর খাবে না। কিছুক্ষণ পরে আবার ক্ষুধা লাগে। ঠিক সেরকম খুব যখন তেষ্টা পায়, মনে হয় একটা সাগর দিলেও খেয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু এক গ্লাসেই সেই তেষ্টা নিবারণ হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, একটা ইঙ্গিত যেন প্রতিমুহূর্তে পাচ্ছি। এর থেকে কি শিক্ষণীয় পাচ্ছি? কিসের ইঙ্গিত বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে? বলছে, যতই তুমি খাও, যতই তুমি দুনিয়া ভরে দাও, ভরা আর হয় না। কেন ভরা হয় না? কারণ আমরা ভরার মধ্যে নেই। আমরা খালির মধ্যে আছি।

আমাদের এখানে কয়েকটা গাড়ি চলে, তাতেই কত accident. আর মহাশূন্যের জগতে অনন্ত কোটি সৃষ্টবস্তু গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য- কই সেখানে তো accdient ঘটছে না।

যখন তেষ্টা পায়, মনে হয় একটা সাগর দিলেও খেয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু এক গ্লাসেই সেই তেষ্টা নিবারণ হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, একটা ইঙ্গিত যেন প্রতিমুহূর্তে পাচ্ছি।

আমরা ভরার জন্য অগ্রসর হচ্ছি। সেই চেষ্টাতেই এগিয়ে চলছি। ভরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই চেষ্টার মাধ্যমেই ফুটে উঠছে আমাদের বুদ্ধি, বিচার, চেতনা। প্রতিমুহূর্ত্তে খেয়াল রাখবে, জীবনে যা কিছু করছো,

দুধটা থেকে মাখন কি এমনি দলা হয়ে বেরিয়ে আসে? দুধে খ্যাট খ্যাট করে টানলে, তখন বের হলো। মহাশূন্যে পৃথিবীটাও সেরকম মাখনের মত কণা কণা হয়ে বিরাজ করছিল, প্রতিটি কণাতে আবার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে।

মনে হয় যেন মিটে গেল, কিন্তু মেটে আর না। এই যে একটা অদ্ভুত অবস্থা, অদ্ভুত জায়গায় আছি বলেই এইরূপ হয়। এই পৃথিবী যে একটা দলার মতো পড়লো, শুধু এই পৃথিবীই নয়, এরকম কোটি কোটি পৃথিবী দলার মত মহাশূন্যের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই খালি জায়গায় এত মাটিই বা কোত্থেকে আসলো? এখানে একটু মাটিও পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আর খালি জায়গার মধ্যে এতবড় মাটির দলা কোত্থেকে আসলো? দুধটা থেকে মাখন কি এমনি দলা হয়ে বেরিয়ে আসে? দুধে খ্যাট খ্যাট করে টানলে, তখন বের হলো। মহাশূন্যে পৃথিবীটাও সেরকম মাখনের মত কণা কণা হয়ে বিরাজ করছিল, প্রতিটি কণাতে আবার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। এই যে ফুলটা, এটা এই হাতে নেবে না ঐ হাতে নেবে, এটা যেমন তোমার ইচ্ছা, ঠিক সেরকম প্রতি কনাতে ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। কুলি মজুর, এমন কেউ নেই পৃথিবীতে যে বলবে, আমার কেউ নেই। সবারই দু'চারজন বন্ধু আছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের company চায়। দুই বন্ধু মিলছে, এই যে মিলন, কণাগুলো কণার সঙ্গে মিলতে চায়। কণাগুলো মিলতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক কণার ইচ্ছাশক্তি আছে। এমন কণা আছে, চোখে দেখা যায় না, যন্ত্রেও দেখা যায় না। মনে হয়, সমস্ত শূন্যটাই একটা কণাশক্তির রূপ। এভাবে প্রত্যেকের ইচ্ছাশক্তি মিলতে মিলতে মনে হলো, এতগুলি ইচ্ছাশক্তি যদি একজায়গায় মেলে, তখন তারা ভাবতে থাকে, আমরা তো একজায়গায় মিললাম, এখন কি করা যায়? তখন বলে, আমরা ফুটে বার হবো। যেমন পাঁচজন একত্র হলেই একটা অভিমত হয়, একটা মতে আসতে চেষ্টা করে, সেইরূপ কণা কণা সব মিলতে মিলতে বিরাট হয়ে গেল। আবার এমনও হয় যে, বিরাট বিরাট ছিল, তা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে বের হলো। ফাঁকা জায়গায় কাছে এই পৃথিবীটা একটা কণার মতো।

পৃথিবীটা এমন একটা শক্তির কাছে আশ্রয় নিয়েছে যে, ওর কাছে কোন কিছুই বড় হতে পারছে না। কোটি বছর ধরে চললেও দেখবে যে,

পৃথিবীটা এমন একটা শক্তির কাছে আশ্রয় নিয়েছে যে, ওর কাছে কোন কিছুই বড় হতে পারছে না। কোটি বছর ধরে চললেও দেখবে যে, যেখানে ছিলে সেখানেই আছো।

যেখানে ছিলে সেখানেই আছো। যখন কণাগুলো একসাথে হলো, সমস্ত কণা মিলে কি করলো? তখন তারা ঠিক করলো, আমরা তো একত্র হয়েছি, এখন আমরা ফুটে বের হবো। এই ইচ্ছা জাগলো। ফাঁকা জায়গা হতে ইচ্ছাটা আপনি রূপ নিতে লাগলো, যে কোনো রূপ নিল। প্রত্যেকটার মধ্যেই মনে হয় যেন সবার ইচ্ছাশক্তি এসে আপন রূপ নিয়ে বের হলো। সবারই ইচ্ছাশক্তিটা এক ইচ্ছার মধ্যে এসে অদ্ভুত রূপ গজাতে আরম্ভ করলো। সমস্ত পৃথিবী হতে রূপ যেন একটা ইচ্ছায় বার হলো। ওর ইচ্ছায় আবার আর একটা রূপ নিলো। এভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধাপে ধাপে অবস্থার চাপে প্রয়োজনের তাগিদে, আজকে যে রূপটা দেখছো, সেটা আসলো। এমন একটা সময় আসতে পারে, কয়েক পুরুষ পরে মানুষের মুখটা বা কানটা লম্বা হয়ে গেল। জল বাতাস পরিবেশে তার জিহ্বা, রক্ত ভিন্ন ভিন্ন হতে আরম্ভ করে। মনন করলে, ধ্যান করলে সত্যিকারের রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ চিন্তার ধারা চলছে বলেই, আজকের যে পরিবেশ সেটাই চলছে। সেটার বাড়তি কমতি হচ্ছে না। আজকের যে জীবজগৎ, যার যার প্রয়োজনে চিন্তাধারাতে এই অবস্থায় আজ পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যেই আবার সেই আদি ইচ্ছাশক্তিটা কাজ করছে। যে কোন ব্যক্তিকে যদি দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, এখানে এইভাবে ধ্যান করো, তাহলে সে ঘোড়া হতে পারে বা বাঘ হতে পারে।

মনন করলে, ধ্যান করলে সত্যিকারের রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ চিন্তার ধারা চলছে বলেই, আজকের যে পরিবেশ সেটাই চলছে। সেটার বাড়তি কমতি হচ্ছে না।

বাঘ, সিংহ বা ভেড়া হলো, সেটা বড় কথা নয়। জীবগ্রন্থ বা প্রকৃতির গ্রন্ধ হতে এই ইঙ্গিতই পাচ্ছি যে, তোমাদের যে মন বা শক্তি আছে, সেটাকে যদি একটু ব্যবহার করো, একটু যদি চিন্তা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে, ভগবানই হোক বা যেই হোক, সর্বশক্তির যে অবস্থা হতে যে কণাশক্তি আপন সুরে বের হয়েছে, সে সমস্ত কিছুর সমাধান নিয়েই বের হয়েছে। তাই এই দেহযন্ত্রই সকল কিছুর

শরীরের কোন জায়গায় চুলকালে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জায়গায় হাত যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

জিহ্বায় চুল পড়লে জিহ্বা যেমন সচেতন করে দিচ্ছে, এবং চুল না ফেলে দেওয়া পর্যন্ত যেমন জিহ্বা সজাগ, ঠিক সেরকম আমাদের চিন্তাধারাতেও অস্বস্তি ভাব সেইরূপ সজাগ করে দিচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলছে, সজাগের জিহ্বা প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে রয়েছে।

সমাধানের যন্ত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাধানে আসছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মন তার চেষ্টা করে চলেছে। শরীরের কোন জায়গায় চুলকালে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জায়গায় হাত যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এই অসোয়াস্তি (অস্বস্তি) আজও মনের মধ্যে চলছে। ঠিক মতন মিল হচ্ছে না। এই জগতের রূপ যদি ধ্যানে চিন্তাতে হয়ে থাকে, তবে আমাদের কাজ আমাদের উপর নির্ভর করছে। সেই বিষয়বস্তুর উপর যদি নির্ভর করি, নিশ্চয়ই আমরা সেই সুরে মিলতে পারবো। মনের যন্ত্রে সমাধানের যে বিষয়বস্তু রয়েছে, তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে যে হবে, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। জিহ্বায় চুল পড়লে জিহ্বা যেমন সচেতন করে দিচ্ছে, এবং চুল না ফেলে দেওয়া পর্যন্ত যেমন জিহ্বা সজাগ, ঠিক সেরকম আমাদের চিন্তাধারাতেও অস্বস্তি ভাব সেইরূপ সজাগ করে দিচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলছে, সজাগের জিহ্বা প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে রয়েছে।

আমাদের মধ্যে সজাগের বিষয়বস্তু এমন সুন্দরবাবে রয়েছে, কাজে যাতে আমরা লাগাতে পারি, সেই চিন্তায় সে সদা সর্বদা সজাগ। তারজন্য বনে যেতে হয় না। অতি সহজের মধ্যেই সে রয়েছে। সহজ ধ্যানের মধ্যে রয়েছে। আমরা তারই ক্রমধারারই ধারা। সেই ধারাতে আমরা যদি এগিয়ে যাই, অনিবার্য হবেই এবং হতে বাধ্য। যারা এই বিশ্বের সুরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, তারাই একমাত্র এই মানসিক অসোয়াস্তির হাত হতে রেহাই পেয়েছে।

আমি জন্ম থেকেই বিশ্বের সেই সুর নিয়ে এসেছি। সামান্য জিনিস দিতে আমি আসিনি। নিজের কথাই বলছি, বিশ্বের সেই আদি শক্তি, যখন কিছুই ছিল না, সেই আদিতম বীজশক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই তোমাদের ঠাকুর এখানে এসেছেন। সেই বীজই

যার দিকে তাকাই দেখি, এখনও ২০ হাজার জন্ম। এই ৬০/৬৫ বছরের আয়ুর মধ্যে কিভাবে সেটা সম্ভব? তখন চিন্তা করলাম, আমার পথ করতে হবে ইঞ্জিন আর বগির মতো।

তোমাদের দান করা হয়েছে। সেই মন্ত্রই একদিন তোমাদের ভিতরে জেগে উঠবে। আমার কাজ হচ্ছে, যে জ্যোতি যে আলো, যে চিন্তাধারা হতে আমি এসেছি, সব ভক্তকে যাতে সেখানে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। যার দিকে তাকাই দেখি, এখনও ২০ হাজার জন্ম। এই ৬০/৬৫ বছরের আয়ুর মধ্যে কিভাবে সেটা সম্ভব? তখন চিন্তা করলাম, আমার পথ করতে হবে ইঞ্জিন আর বগির মতো। একজনের ছেলে মারা যাচ্ছে, আমাকে এসে বললো। চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, একে যদি বাঁচাই, আরও বিশ হাজার বাচ্চা মারা যাবে। তোমরা অতদূর দেখতে পাও না বলে রক্ষা। তাই সমূহ যে মারা যাচ্ছে, তার দুঃখটাই বড় হয়ে যাচ্ছে। যারা universal Mathematics নিয়ে চলে, একমাত্র তাদের গণিতের গণনাতেই এগুলো ধরা দিচ্ছে। সাধারণেরা সামনে যাকে পায়, তাকেই জড়িয়ে ধরে। সেটাকেই বড় করে দেখে। ঐটাই মায়ার খেলা। একজনের অপারেশন হবে খবর দিল। আমি দেখলাম মারা যাবে। চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারি। কিন্তু করতে গিয়েই দেখি, আরও প্যারাশনিতে পড়বে। এরকম কতো আসে। কোর্টে কেস চলছে, ইচ্ছা করলে জেতাতে পারি। কিন্তু আমি সবসময় দেখি, কি করলে বিরাট স্বাদের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। চিন্তা করি, কোন্‌দিকে আটকিয়ে আছে; আর কি করলে যাতে আর জন্ম না হয়, বিরাটের পথে নিয়ে নেওয়া যায়। সেজন্যই গুরু সঙ্গত করতে হয়। গুরুর তত্ত্বে বিভোর থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই যেন গুরুর সঙ্গে মধুর সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। আমার কথা বিশ্বের সেই আদি খনির কথা। এটা বিজ্ঞানসম্মত গভীর তত্ত্ব।

সেজন্যই গুরু সঙ্গত করতে হয়। গুরুর তত্ত্বে বিভোর থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই যেন গুরুর সঙ্গে মধুর সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

জনৈক ভক্তের প্রশ্ন ঃ- ঠাকুর ২০/২৫ বছর আগে যে দীক্ষা নিয়েছে আর আজ যে দীক্ষা নিল, দুজনেই কি সমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর ঃ- কবে দীক্ষা নিয়েছে, তার থেকেও বড় কথা, কতো আয় করেছে। একজন মাসে ১০০ টাকা রোজগার করে। সে ২০ বছরে যত

আয় করবে, দেখা গেল, আর একজন যে মাসে ৫০০০ টাকা রোজগার করে, সে কয়েক মাসেই সেটা আয় করে ফেললো। এটা ব্যাঙ্কে জমা রাখার মতো। একজন সারাদিনে ৫/১০ বার জপ করে। আর একজন কয়েক হাজার বার জপ করে। যে বেশী খাটবে, তারই হবে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমরা কাজ করে যাও। মন বসুক বা না বসুক, তোমরা শুধু গুরু বলছেন, এই চিন্তা করে কাজ করে যাও। মন বসিয়ে এই পৃথিবীতে কেউ কিছু করে না। বাচ্চা শিশু এলোমেলো মন নিয়েই সব ভাষা শিখে নেয়। যে বাড়িতে আমি এখন আছি, সেখানে বাচ্চা বাচ্চা শিশুরা কি সুন্দর ইংরেজি বলে, আমি অবাক হয়ে শুনি। তোমাদের শিখতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তাই তোমরা শুধু আমি যেটা বলবো, সেইভাবে চলবে এবং জপের সংখ্যা বাড়িয়ে যাবে। পাহাড়ে যারা আকুল ব্যাকুলভাবে ডাকছে, তাদের ডাক আমার বুকে এসে বাড়ি খাচ্ছে। তোমরা শুধু একটু কাজ করে যাবে। একটু বসে গভীরভাবে চিন্তা করবে। মনে যেকোন চিন্তা আসুক, ক্ষতি নাই, তোমরা শুধু ঠিকমতো কাজ করে যাও। তোমাদের জপের ধ্বনি লক্ষ লক্ষ সুর টেনে আনবে। কিছুদিন পর তাতে একেবারে ডুবে যাবে। ঐ ধ্বনি বেশী করলে দেখবে, একটা আমেজ এসে পড়েছে। একদিন দেখবে, বহু ভাসয়মান শব্দ যেন তোমাকে guide করে নিয়ে যাচ্ছে। ফুটতে শুরু করলে দূর থেকেই ঠাকুরকে দেখতে পাবে। দেখবে, ঠাকুর এসে প্রেরণা জোগাচ্ছে। সবসময় সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করছে। অতি সহজভাবেই উপলব্ধি করতে পারবে। তোমরা তো কাজ করো না। একটু কাজ করো। সময় চলে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের দান অবহেলায় নষ্ট করছো। পরে যেন আফশোস করতে না হয়। আজ এই থাক।

একজন সারাদিনে ৫/১০ বার জপ করে। আর একজন কয়েক হাজার বার জপ করে। যে বেশী খাটবে, তারই হবে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমরা কাজ করে যাও।

ফুটতে শুরু করলে দূর থেকেই ঠাকুরকে দেখতে পাবে। দেখবে, ঠাকুর এসে প্রেরণা জোগাচ্ছে। সবসময় সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করছে। অতি সহজভাবেই উপলব্ধি করতে পারবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বস্তু নিয়েই এই পৃথিবী

পাম এ্যাভিনিউ

১৭-৬-১৯৬৫

সময় ৭-২০ মিঃ থেকে ৮-২০ মিঃ

এই পরিদৃশ্যমান জগতে যন্ত্রে যে কথাগুলো আসে, যন্ত্রের দ্বারা যে জিনিস কানে আসে, সেটা মননের মাধ্যমেই হয়, এই যন্ত্রের ক্রিয়া মনেরই ক্রিয়া। মন হতেই যন্ত্র বের হয়েছে। যন্ত্রের রূপ তো মন ছাড়া নয়। পরিপার্শ্বিক জগতে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা সকলেই প্রত্যক্ষ করছে। আমাদের এই দেহ, এটাও একটা যন্ত্র। দেহ যন্ত্রে যে কাজ হচ্ছে বা আমরা করছি, এটা যন্ত্র নামে অভিহিত হলেও, এ যন্ত্র ঠিক সেই যন্ত্র নয়। পৌরাণিক যুগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে যজ্ঞ করতেন, সেখানে যন্ত্র থাকতো, মনও থাকতো।

দেহ যন্ত্রে যে কাজ হচ্ছে বা আমরা করছি, এটা যন্ত্র নামে অভিহিত হলেও, এ যন্ত্র ঠিক সেই যন্ত্র নয়। পৌরাণিক যুগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে যজ্ঞ করতেন, সেখানে যন্ত্র থাকতো, মনও থাকতো।

ঔষধ বিভিন্ন পথ দিয়ে, বিভিন্ন বিষয় বস্তু দিয়ে তৈরী হয়, তারপর তা ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই, সেটা তো যন্ত্রের মতনই কাজ করছে।

যে জিনিস চোখের সামনে আবিষ্কার হয়েছে তাতে দেহের ভিতরকার এক কণাশক্তি বের হয়েছে, তার কোটিগুণ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। যন্ত্রের ভিতর দিয়ে, কঠিন বস্তুর ভিতর দিয়ে আমরা সেগুলো রূপ দিতে চাইছি।

প্রত্যেকটি বস্তু নিয়েই এই পৃথিবী। জাগতিক বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যেই আমাদের এই জীবনধারণ শিক্ষাদীক্ষা যা কিছু, বাস্তব সাহায্য নিয়েই এখানে সব কিছু হচ্ছে। এই যে বস্তুর সম্মেলন, এতো মন হতেই। জীবনে চলার পথে আমাদের যা কিছু সুযোগ সুবিধা, সবকিছুই মননের মাধ্যমে জাগতিক বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়েই হচ্ছে। জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমরা ভাত খাচ্ছি, ডাল খাচ্ছি, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করছি। তার ফলে শরীরে যে পুষ্টিসাধন হচ্ছে, সেগুলো দেহযন্ত্রের সাহায্যে যে কাজকর্ম, তারই একটা রূপ। এই যে সমস্ত আণবিক বা এ্যাটমিক জিনিস আবিষ্কার করেছে, ক্ষতিকারকই হোক বা ভালোর জন্যই হোক, যেপথই বের করুক না কেন ঔষধের মতন চিন্তাধারার সাহায্যেই করেছে। বাস্তবে যা কিছু বের হবে, দেহের ক্রিয়ার দ্বারা সেটি অনায়াসে করতে পারবে। যে জিনিস চোখের সামনে আবিষ্কার হয়েছে তাতে দেহের ভিতরকার এক কণাশক্তি বের হয়েছে, তার কোটিগুণ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। যন্ত্রের ভিতর দিয়ে, কঠিন বস্তুর ভিতর দিয়ে আমরা সেগুলো রূপ দিতে চাইছি। তোমরা যে সূক্ষ্মবস্তুর সহিত, সূক্ষ্ম চিন্তাধারার সহিত জড়িত ছিলে, এগুলি তারই ইঙ্গিত, তারই আভাষ।

সূর্য উদয়ের সময়ে যে আভাষ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, আমাদের শিরা-উপশিরাকে, আমাদের দেহযন্ত্রকে সেই হিসাবে চালনা করলে, এই যন্ত্রের সাহায্যে যা পারা যায়, তারচেয়ে অনেক বেশী গতিতে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি। ছোট শিশু হাত পা নেড়ে নেড়েই বড় হয়ে একদিন ভীম-ভবানী হয়। নতুন করে তার হাত-পা গজায় না। হাত পায়ের সঞ্চালন করেই সে একদিন ব্যায়ামবীর হয়, বুকের উপর হাতী নেয়। সেই নবজাত শিশুকে হাত-পা নাড়ানো কেহ শিখিয়ে দেয় না। এটা না থাকলে প্রত্যেকটা শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল না হয় কঠিন হয়ে যেত। এই ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়েই এক একজন বিরাট শক্তিশালী, বিরাট ব্যায়ামবীর হয়ে গেল। এই যে বৈজ্ঞানিকেরা নানা বস্তু আবিষ্কার করছে, এটাও শিশুর হাত-পা ছোঁড়ার

ন্যায়। এই আবিষ্কারগুলো যে হলো, তাতে কি ইঙ্গিত ছিল? শিশুর হাত-পা নাড়া যেমন শিখতে হয়নি, তেমনি ওটাও স্বাবাভিকভাবে বের হয়েছে। ঔষধ আবিষ্কার হলো, কত কিছু আবিষ্কার হলো। আবিষ্কার করলো কোথায়? যে জিনিস ছিল, তাই তো বের হল।

একদিন দুদিনের শিশু ওঁয়া ওঁয়া ছাড়া কোন ভাষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। জন্মগতভাবে কোন শিশু বাংলা নিয়ে আসেনি, হিন্দি নিয়ে আসেনি, গুজরাটি নিয়েও আসেনি। সব শিশুর যদি এক বোল হয়, যেখানকার যেটা পায়, সেটা নিয়েই বসে যায়। শিশুর এই যে এলোমেলো ভাব, এতে জানবার ইঙ্গিত আছে। এক বৎসরের শিশু যে ইংরেজী বলে, তা বলতে আমাদের অসুবিধা হবে। তিন, চার, পাঁচ বৎসরের শিশু যা ইংরেজী বলে, আমাদের দাঁত ভেঙে গেলেও বলতে পারবো না। তাকে বড় বড় বই দেওয়া হয়নি, মানচিত্রও দেওযা হয়নি। এখানে রিক্সওয়ালাকে যদি ঐ ইংরাজী বলতে হয়, তার হাত-পা ভেঙে গেলেও পারবে না। সেইরকম আবিষ্কারেরও একটা এলোমেলো ভাব আছে, বুদ্ধি আছে। এই এলোমেলো আবিষ্কার বুদ্ধি বিশ্বের সবার ভিতরে সব বিষয় বস্তুতে আছে। কেন সবার তাড়াতাড়ি হয় না? আমরা যদি একটি শিশুকে বোবার দেশে রাখি, বিশজন কথা না বলা দেশের মানুষের ভিতর যদি একটি শিশুকে রেখে দাও, সেও এ্যাও এ্যাও করবে। আর অন্য ভাষা শিখতে পারবে না। আমাদের আবিষ্কারের বুদ্ধিবৃত্তিও খানিকটা পরিবেশ অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমরা এমন পরিবেশে আছি, এমন কৌশল আবিষ্কার করেছি, শয়তানি বুদ্ধি করছি যে, ভালো কিছু আর করতে পারছি না। এই যে গাঁটকাটা, পকেটমার সবই কিন্তু আবিষ্কারের বুদ্ধি থেকেই হচ্ছে। ল্যাবরেটারিতে গবেষণা করে অবিষ্কার

একদিন দুদিনের শিশু ওঁয়া ওঁয়া ছাড়া কোন ভাষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। জন্মগতভাবে কোন শিশু বাংলা নিয়ে আসেনি, হিন্দি নিয়ে আসেনি, গুজরাটি নিয়েও আসেনি।

এই যে গাঁটকাটা, পকেটমার সবই কিন্তু আবিষ্কারের বুদ্ধি থেকেই হচ্ছে। ল্যাবরেটারিতে গবেষণা করে অবিষ্কার করাটাই শুধু আবিষ্কার নয়। যে যা করছে, সবটাই আবিষ্কার। ম্যাজিক তাও আবিষ্কার। যে যে লাইনে যায়, সেটাই আবিষ্কার।

করাটাই শুধু আবিষ্কার নয়। যে যা করছে, সবটাই আবিষ্কার। ম্যাজিক তাও আবিষ্কার। যে যে লাইনে যায়, সেটাই আবিষ্কার। ডাক্তার সবচেয়ে বেশী। অসুখের কথা বললেই ওষুধের কথা বলবে। হয় গরম জল না হয় চুন বেলপাতা বাটা দেন, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের হাজার কথা বলবে। যে যা সুযোগ পাচ্ছে, বলে যাচ্ছে, করে যাচ্ছে। এটাও ভাষা, প্রত্যেকের জীবনে এগিয়ে যাওযার ভাষা। যারা অভিনয় করে, পেট খিঁচাতে খিঁচাতে ঢুকছে স্টেজে, এও শিখতে হয়। এটা যে শিখতে হবে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেখে। আবার যে চানাচুর বিক্রী করার পার্ট নেয়, সেটাও শিখতে হয়।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সৃষ্টি করার প্রবণতা আছে, বুদ্ধি আছে। প্রকৃতির নিয়মে কত রকমের সূক্ষ্ম শক্তি আছে। সেইগুলো বাস্তবের ভিতর দিয়ে, বস্তুর ভিতর দিয়ে জীবের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে, প্রত্যেকের ভিতরে প্রত্যেকটির ক্ষমতা আছে। প্রত্যেক জীবজন্তুর ভিতরে সেই শক্তি আছে। আগেও বলেছি, ১৫/২০ মাইল দূরে আঘাত পেয়ে সেই সর্প চলে আসছে আঘাতদানকারী ব্যক্তিকে দংশন করতে। কাঁঠাল ভাঙ্গলে ২ মাইল দূর থেকে মাছি এসে ভন্ ভন্ করছে। প্রকৃতির মাঝে এত সূক্ষ্ম জীব আছে, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন জীবজন্তু আছে যে, জানলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। প্রকৃতির সৃষ্টিতে এত বৈচিত্র্য কেন? এরা (এই সব জীবজন্তু) তাদের নিজস্ব ভাব নিয়ে এসেছে। এমন জন্তু আছে, এখানে কি হচ্ছে, একশো মাইল দূর থেকে টের পাচ্ছে। সে ঠিক তার সময়মতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এই জগতে যত রকমের ক্ষমতা আছে, প্রত্যেকের ভিতরে সেই ক্ষমতা আছে। তবে সকলের মাঝে তা প্রকাশ পায় না কেন? জাপ্য হয়ে আছে। তুমি ডুব দিলে দূর থেকে টের পেয়ে, কুমীর ঠিক তোমায় নিয়ে যায়। দূর থেকে রক্ত টেনে নেয়, এমন জীব আছে। আমরা পারছি না কেন? আমাদের হচ্ছে না কেন? বাংলা দেশের ভাষা শিখে বিহারী ভাষা

এই পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে, প্রত্যেকের ভিতরে প্রত্যেকটির ক্ষমতা আছে। প্রত্যেক জীবজন্তুর ভিতরে সেই শক্তি আছে।

সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। সুযোগ সুবিধা পেলে অনেকেই এগিয়ে যেতে পারে। হোক বা না হোক, সমশক্তির, সকল শক্তির অধিকার নিয়েই জীব জন্মগ্রহণ করেছে।

শিখতে পারছে না। এক বাংলাদেশেই চিটা গাঙ্, নোয়াখালিতে অদ্ভুত রকমের ভাষা আছে। আমাদের নিজেদের ভিতরেও এইরকম বহু জটিলতা এসে বাসা বেঁধেছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অচেনা অজানা হয়ে গেছি। তাই আমাদের মনের ভাষাও বহু জটিলতার আবর্তে ঘুরে ঘুরে অজানা অচেনা ভাষা হয়ে গেছে। কেহ আবার ১০/২০ টি ভাষা জানে। কেউ কোন জিনিস বের করার প্রচেষ্টায় সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। সুযোগ সুবিধা পেলে অনেকেই এগিয়ে যেতে পারে। হোক বা না হোক, সমশক্তির, সকল শক্তির অধিকার নিয়েই জীব জন্মগ্রহণ করেছে। আম থেকে আম হয়। কাঁঠাল গাছের বীজ পুঁতলে কাঁঠাল গাছই বের হবে।

সূর্য হতে তোমার উৎপত্তি। সূর্য হতে যা বের হবে, তাতে চেতনার উন্মেষ হবে, চৈতন্যের সৃষ্টি হবে । সূর্যের সঙ্গে মানুষের চেহারার মিল্‌তি না হতে পারে, উভয়ে তো একই বস্তু। সূর্য হতে যা সৃষ্টি হবে, সেটা সূর্যই হবে। তবে আমরা বুঝি না কেন? ১০০/১৫০ বটবৃক্ষের বীজ পকেটে নিয়ে গেলে কি বুঝতে পারবে যে, এক একটা গাছের উপর তোমার মতন হাজার দুহাজার মানুষ বসতে পারে। হাতীর বীজ এতটুকু। এটা যে ২০০ মণ হাতীতে পরিণত হবে, সেটা কি বুঝা যায়? আমাদের যে চেহারা, তাতে এটা যে সূর্য, কেউ বুঝবে? এতবড় মনন শক্তি এর (মানুষের) ভিতরে আছে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তুমি এখানে বসে আছ, সেকেন্ডে সূর্য ঘুরে এলে, চন্দ্রে চলে গেলে। আকাশপানে তাকিয়ে তোমার গতি ৫০০ কোটি মাইল দূরে কোন্ গ্রহে চলে গেছে। কতবড় শক্তি, কতবড় তেজ থাকলে এটা হয়। তোমার দৃষ্টি যতদূর যাবে, তুমি ততদূর যাবে। দেখ, কতবড় ক্ষমতা। এখান থেকে বসে জোনাকির মতো একটা গ্রহ দেখছো, ৫০০ কোটি মাইল দূরে।

দৃষ্টির সাথে সাথে তোমার সত্তা, তোমার বিষয়বস্তুর সত্তা, তোমার সারা চলেগেছে সেখানে। তুমি ভাবছো, গেলাম কি করে? তুমি বুঝতে পারছো, সঙ্গম না হলে সৃষ্টি হয় না। দৃষ্টির সাথে সাথে সঙ্গম হয়ে গেল। মিলন হয়ে গেল। তোমার সাড়া চলে গেল ওখানে।

দৃষ্টির সাথে সাথে তোমার সত্তা, তোমার বিষয়বস্তুর সত্তা, তোমার সাড়া চলে গেছে সেখানে। তুমি ভাবছো, গেলাম কি করে? তুমি বুঝতে পারছো, সঙ্গম না হলে সৃষ্টি হয় না। দৃষ্টির সাথে সাথে সঙ্গম হয়ে গেল। মিলন হয়ে গেল। তোমার সাড়া চলে গেল ওখানে। দুজনে একসঙ্গে হলে, একত্র হলে মিলন হয়? হ্যাঁ হয়। বিবাহের সময় দুজনে একই দিকে তাকায়। নাক, মুখ, চোখ, কান সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এক হওয়ার কথা বলে। সৃষ্টি শুধু লাফিয়ে লাফিয়ে হয় না। দেখে শুনে তন্ময় হয়ে একত্র হয়। তারপর ওঁয়া ওঁয়া হয়। এমনি এমনি বাচ্চা হয় না। ঐ যে বীর্য ক্ষয় হল, মন ওখানে চলে গেল। তাকানোর সাথে সাথে দর্শন হলো। তখনই বৃত্তির নিবৃত্তির সাথে সাথে সৃষ্টি হয়ে গেল। ছাপ ফেলতে ফেলতে শেষ হয়ে গেল। সারারাত্রি খেঁজুর রস টপ টপ করে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখি, এক কলসী নিয়ে বের হল। বৃষ্টিও ফোঁটা ফোঁটা করে পরে, তাতেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক ফোঁটা ওখানে, এক ফোঁটা এখানে যেটা পরছে, কাজেই সেটা দানা বাঁধতে পারছে না। এই ফোঁটা ফোঁটা করতে করতে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে করতে কখন সমানে সমানে দাঁড়িয়ে যায়। তোমার সত্তা ৫০০ মাইল দূরে গিয়ে গ্রহের সাথে মিশে গেল। এই যে মিলন হল, সৃষ্টি হল, এরফলে তুমি যখন খুশী সেখানে যেতে পার। এই যে ইঙ্গিতগুলো পাচ্ছ, এই ইঙ্গিত ধরে ধরে চলতে হবে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ গুণে শেষ করা যায় না। প্রত্যেকটির ভিতর লোক আছে, ঠাকুর আছেন।

এই যে অনন্ত গ্রহ, অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রকৃতির এই অদ্ভুত সৃষ্টিই এক একটা বীজ। সেই বীজ হতে আমরা এসেছি। সূর্যই সৃষ্টির শেষ রূপ নয়। সূর্য ভাবছে, তার রূপ বিশ্বের স্রষ্টার অপরূপ রূপ। সূর্য যদি বিশ্বের স্রষ্টার রূপ হয়ে থাকে, আমরা কি ল্যাছড়ার রূপ নাকি? আমরাও স্রষ্টার রূপ। নাহলে আমাদের মধ্যে এতসব কেন? সাগরে না আছে, এমন কী আছে? এতবড় সাগর। এক গ্লাস জল খেতে পারবে না। তৃষ্ণা নিবারণ হল না। তাই বলে কি সাগর তুচ্ছ বস্তু? এক হাত

এই যে অনন্ত গ্রহ, অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রকৃতির এই অদ্ভুত সৃষ্টিই এক একটা বীজ। সেই বীজ হতে আমরা এসেছি। সূর্যই সৃষ্টির শেষ রূপ নয়। সূর্য ভাবছে, তার রূপ বিশ্বের স্রষ্টার অপরূপ রূপ।

দূরে খনন কর, জল পাবে। আমাদের বীজশক্তি কেমন? সাগরের সামনে যত বেশী, তত বেশী তেজ। সাগর থেকে যত দূরে যাও একটু বেশী খুঁড়লে (খনন করলে) তবে পাবে। মনন করে খনন করলেই পাওয়া যাবে সব কিছু। আমাদের মনের ভিতর যা কিছু শয়তানি, যা কিছু উথাল-পাথাল ওগুলো সাগরের ফেনা। সাগরের ফেনা সাগরেই মেশে। আমাদের জীবনে যাবতীয় যা কিছু সবটাই সাগরের ফেনা। ডাল রান্না করার সময় ডালের জলের ওপরে ফেনা হলে, ফেনা কেটে ফেলে দেয় আবর্জনা স্বরূপ। মিষ্টি জ্বাল দিলেও ফেনা কেটে ফেলে দেয়। টিন ভর্ত্তি হয়ে যায়। তাই বলে কি সাগর শুকিয়ে যায়? ঐ ফেনা কেটে ফেললে পরিষ্কার হয়ে যায়। কোন পচা জিনিস খেলে, গন্ধ পেলে বা দেখলে আমরা থু থু করে ফেলে দিই। থুথু-টাও ফেনা। এতগুলো ফেনার কি প্রযোজন ছিল? এটা কি কেউ তোমার মুখের ভিতর দিয়ে দিয়েছে? এতগুলো ফেনা ফেলে দিলে, মানে পরিষ্কার হলো। থুঃ করলে বলে কি মাথাটা কেটে ফেলে দিলে? নাকটা কেটে ফেলে দিলে? ফেনা চলে গেল, থুথু চলে গেল। ফেনা আমাদের ভাল লাগে না। হতাশ, নিরাশ এসব ফেনা। ঢেউয়ে এগুলো উঠবেই।

আমাদের মধ্যে ঢেউ চলেছে সবসময়। পুরীতে গেলে দেখবে, সাগরে সবসময় ঢেউ। বাতাসে যদি ঢেউ থাকে, সাগরে যদি ঢেউ থাকে, আমাদের মধ্যে ঢেউ থাকবে না কেন? আমরাও তো সূর্য, আমরাও তো পৃথিবী। পেটের ভিতর কলকলই শুধু ঢেউ নয়। মনের ভিতরে উথাল পাথাল, মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, এ সবই ঢেউ। যে দিক দিয়ে যাক, ঢেউ চলেছে। বাপের অসুখ, মায়ের অসুখ, এই যে ঢেউ সবার মধ্যেই আছে। অশান্তি কার না আছে? ভাল লাগে না, হৈ হুল্লোড়, চিৎকার চেঁচামেচি, ঢেউ আর ফুরায় না। সাগরেরও শেষ নেই। মনের অশান্তিরও শেষ নেই। অনন্ত ঢেউ চলেছে। ঘুমলাম তাতেও শান্তি নেই আজেবাজে স্বপ্ন দেখছি। ঘুমের মধ্যে হিসি করেছি। সাগরের ঢেউ চলেছে। এই ঢেউ অফুরন্ত, এর শেষ নেই।

বাতাসে যদি ঢেউ থাকে, সাগরে যদি ঢেউ থাকে, আমাদের মধ্যে ঢেউ থাকবে না কেন? আমরাও তো সূর্য, আমরাও তো পৃথিবী। পেটের ভিতর কলকলই শুধু ঢেউ নয়। মনের ভিতরে উথাল পাথাল, মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, এ সবই ঢেউ।

পৃথিবীর সাথে গ্রহের সাথে আমাদের মধ্য দিয়ে অফুরন্ত ভাবের প্রকাশ হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলে সূর্যের মত বিরাট ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারি। সৃষ্টির ক্ষমতা আমাদের ভিতরে অফুরন্ত রয়েছে। পাথর অনেক পড়ে আছে। আমাদের পাথর কেটে রাস্তা করতে হবে। পাহাড় কেটে যেমন রাস্তা তৈরী করে। পাহাড়ের গা দিয়েই রাস্তা তৈরী হয়। এক ঘন্টা, দেড় ঘন্টা ঘুরে দেখা গেল, এক জায়গায়ই আছে। একজন উপরে, একজন নীচে। প্রকৃতি আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন তৈরী হওয়ার জন্য। আমাদের বুদ্ধি যা আছে, নূতন করে বুদ্ধি সৃষ্টি করতে হবে না। ঘরের মধ্যে যে চেয়ার টেবিল আছে, রবিবারে একটু ওলট পালট করে এখানেরটা ওখানে, ওখানেরটা এখানে রাখলো। সারাক্ষণ এই কামই (কাজই) করে। আমাদের নূতন করে কিছু করতে হবে না। কেউ বেদ শিখলো, কেউ শাস্ত্র শিখলো, আরে বেটা, নূতন করে কি শিখলি? যা আছে, তাই তো শিখলি। সুয়েজ খাল, চ্যানেল কেটে দুদিনের যে পথ, তা সহজ করে কয়েক ঘন্টা করে দিল। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাস্তবের সবকিছু সাহায্যকারী হিসেবে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। রাস্তা দিয়ে যে যাই, তাড়াতাড়ি চলার সময় একরকম করে হাঁটি; আস্তে আস্তে চলার সময় আরেকরকম করে হাঁটি। আবার যার প্রয়োজন হয়, সে দৌড়ায়। এই চলার ট্রেনিং, হাঁটার ট্রেনিং কেহ শেখায়? এটা আপনাআপনি শেখে, আপনাআপনি দৌড়ায়। স্বাভাবিকভাবে চলে যায়। এই স্বাভাবিক ভাবটাই আমাদের ভিতরে সহজ বুদ্ধিতে আছে। এই স্বাভাবিক ধারাই জাগতিক শক্তির ধারা, সূর্যের ধারা। অনন্ত শক্তির ধারাটা এই সহজ শক্তিতেই আছে। তবে এর একটা ভাষা আছে।

আমাদের নূতন করে কিছু করতে হবে না। কেউ বেদ শিখলো, কেউ শাস্ত্র শিখলো, আরে বেটা, নূতন করে কি শিখলি? যা আছে, তাই তো শিখলি।

ইংরাজীতে ২৬টা অক্ষর আছে। এই ২৬টা অক্ষরের সাহায্যে সম্পূর্ণ ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। আবার বাংলা ৩৬টি অক্ষরের সাহায্যে ইচ্ছা করলে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যাবতীয় যা কিছু জানতে পারা যায়। একটা বাচ্চা ওঁয়া ওঁয়া

একটা বাচ্চা ওঁয়া ওঁয়া করলেই বুঝবে, শব্দ বিনে ভাষা ও ভাষা বিনে শব্দ ব্যবহার করা যায় না। প্রকৃতির নিয়মে একটা লোমকূপও কারণ ছাড়া নয়।

করলেই বুঝবে, শব্দ বিনে ভাষা ও ভাষা বিনে শব্দ ব্যবহার করা যায় না। প্রকৃতির নিয়মে একটা লোমকূপও কারণ ছাড়া নয়। ওঁয়া আ কেন করলো? এর পিছনে বিরাট একটা শব্দের কারখানা আছে। দেখা যায়, পিছনে পিঁপড়া অথবা কোন পোকায় কামড় দিয়েছে, কাজেই শিশু কাঁদছে। অথবা হয় গরমে, না হয় পেটব্যথায় শিশু কাঁদছে। না হয় ভিজে কাঁথায় শুয়ে আছে। খুঁজে বের করা যায়, সেই চিৎকারের কারণ। দেখ, এসব কে শেখায়?

এই যে, ওঁয়া আ, এটি দুনিয়ার কারও ভাষা নয়। এই ওঁয়া-আ হতেই প্রণব মন্ত্র। এতেই ওঁ বের হল। ঋষিরা দেখলেন (শুনলেন), বাঃ এই শব্দ। অনন্ত জগতে শব্দের ভাণ্ডার আছে। গ্রহে গ্রহান্তরে জাহাজ যখন ঘোরে, কি শব্দে ঘুরবে, কেউ ঠিক করে দেয় না। কেউ তো বলে দেয়নি, ট্রেন তুই খ্যাঁচ্ খ্যাচ্ কর। প্লেন তুই ভোঁ ভোঁ কর। কেউ বলে দেয় না। বিহারীর বা বাঙালীর, অথবা অসমিয়ার সঙ্গে মিলতি নেই এই ভাষার। যখনই কোন ঘর্ষণে অথবা আপনগতিতে কোন শব্দ বের হচ্ছে, তার সাথে এখানকার কোন ভাষার মিল নেই। তবে ঐ যে ভাষা 'উয়া' 'উঃ' তার সঙ্গে মিল্‌তি আছে। মারা যাবার সময় কেহ কি কবিতা আওড়ায়? শ্বাস উঠেছে, তখন কবিগুরু কি বলেন? জনগণমন ..... বলেন না। এতবড় কবি, তিনিও ওঃ ওঃ করছেন। কুত্তা, ভেড়া, ছাগল, গরু যা বলে, তিনিও তাই বলছেন, উঃ উঃ করছেন। একটা ইঁদুর মরছে, কাক মরছে। ওদের সব ভাষা হারিয়ে গেছে। কবিগুরুর সব বিদ্যা কবিতা সব হারিয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় তখন একভাষা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জন্ম এবং মৃত্যুর সময়ে এক ভাষা, এক শব্দ। এটাই নাদ ব্রহ্ম, নিনাদের ধ্বনি। এটাকেই 'প্রণব মন্ত্র' নামে অভিহিত করলো। যারা ঢের করেছে, তারা খুশী হয়ে চাকর, বাকরদের কিছু কিছু দেয়। 'আমরা বিড়ির দোকান করলাম,' এতেই আমরা বড় বড় পন্ডিত, সাহিত্যিক, কবি। ফেলে দেবার বস্তু সব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, জন্ম এবং মৃত্যুর সময়ে এক ভাষা, এক শব্দ। এটাই নাদ ব্রহ্ম, নিনাদের ধ্বনি। এটাকেই 'প্রণব মন্ত্র' নামে অভিহিত করলো।

ঋষিরা বের করলেন সেই হুঙ্কার ধ্বনি। ধর, বাল্মীকি মুনি, যাঁরা ঐ ধ্বনি বের করলেন, দেখলেন সমস্ত জগতে একটাই শব্দ। ঋষিরা বলেন, এরা বিড়ির দোকান নিয়ে থাকুক। তাঁরা (ঋষিরা) হুঙ্কার ধ্বনি নিয়ে বসে পড়লেন। বাতাসের মধ্যে বেশ ধ্বনি হয়। সাগরের মধ্যে সোঁ সোঁ ধ্বনি হয়। তারা (সাগর, বাতাস) কি লণ্ডনের ভাষা বলে? সব বাতাসের, সব জলের এক ভাষা। সূর্যের রশ্মির মধ্যে ঐ সুরগুলো বের হলো।

রেডিওর মাধ্যমে প্রফুল্ল সেন প্রত্যেকের কাছে সাহায্য চাইছে। রেডিওতে ঐ ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে যে ধ্বনি, সেটা কি তোমার ভিতর সবসময় সজাগ থাকে? বাচ্চারা যে ভাষাজ্ঞানে সব ভাষা শিখে নেয়, সেই ভাষা শিখতে আপত্তি নাই।

আমি স্কুলে (পাঠশালায়) যাচ্ছি কলাপাতা বগলে নিয়ে, পিছনে একটা গরু কলাপাতা খাইতে খাইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে আসে। প্রতিদিন এই হতো। এই ক্লাস হতে অন্য ক্লাসে যেতে পারিনি পয়সার অভাবে। কলাপাতায় লিখতাম। গরুগুলো আমায় চিনতো। তাদের জলটল খাওয়াতাম তো। আমার লগে লগে পাঠশালা পর্যন্ত গেছে। আনন্দ মাষ্টারের পাঠশালায় পড়েছি। আনন্দ মাষ্টারকে বলি, গরুটাকে ভর্ত্তি করে নেন, ও (গরুটা) রোজ পাতা খেয়ে নেয়। অভাব ছিল তো, কলাপাতা আর খাগের কলমে লিখতাম। বাবায় একটা দশ হাইতা (দশ হাত) চাদর দিয়েছে। গরু সেই চাদরটাও খেতে আরম্ভ করেছে। গরুতে যে চাদর খায় জানতাম না। যে রকম সৃষ্টি সেইভাবেই তৈরী হতে হবে।

ঋষিরা সেই হুঙ্কার ধ্বনি নিয়ে, ওঁ ধ্বনি নিয়ে, ঐ ভাষা নিয়েই জপতপে, ধ্যানে বসলেন। সা সা রে রে করে যেমন ওস্তাদ হয়, সা সা রে রে-র মধ্যে যে এত স্বাদ আছে, তখন কি বুঝতো? সেইরকম এই জপে ধ্যানে সুর নিয়ে বসলে, ঐ যে কাজ করছে, তখন চারিদিক হতে, অন্যান্য গ্রহ হতে মহানরাও সংকেত পাঠান, নির্দেশ আসে। সমস্ত গ্রহ হতে ইন্‌স্ট্রাকশন (Instruction) আসছে। জাহাজে যেমন নির্দেশ আসে, ওখানে

ঋষিরা সেই হুঙ্কার ধ্বনি নিয়ে, ওঁ ধ্বনি নিয়ে, ঐ ভাষা নিয়েই জপতপে ধ্যানে বসলেন। সা সা রে রে করে যেমন ওস্তাদ হয়, সা সা রে রে-র মধ্যে যে এত স্বাদ আছে, তখন কি বুঝতো? সেইরকম এই জপে ধ্যানে সুর নিয়ে বসলে, ঐ যে কাজ করছে, তখন চারিদিক হতে, অন্যান্য গ্রহ হতে মহানরাও সংকেত পাঠান, নির্দেশ আসে। সমস্ত গ্রহ হতে ইনস্ট্রাকশন (Instruction) আসছে।

পাহাড় আছে, এইদিক দিয়ে যাও। সুন্দরভাবে নির্দেশ পাচ্ছে। তুমি কাজে বসছো, সমস্ত মহানরা নির্দেশ দেন। যেমন ষ্টেশনে বলে, অত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এই গাড়ী ছাড়ছে। যারা এই জায়গায় যাবে, ঐ গাড়ী ধর। যারা যাবে, সবাই ছুটতে আরম্ভ করেছে। তুমি যখন কাজ করছো, 'তুমি এই চক্রে কাজ করো' গুরু নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন এটাই ভাষা হয়। চমৎকার স্ফূরণ হতে থাকে। সৃষ্টির স্ফূরণ হতে থাকে। বিশ্বজগতের এক ভাষার স্ফূরণ হবে। বিশ্বের ভাষা এটার ভিতর দিয়ে শিখবে। চঞ্চল দুষ্ট শিশু যেমন ভাষা শেখে দৌড়াদৌড়ি করে। তোমরাও ধ্যানে বসে ঐ ভাষা শিখে নাও। তবে ম্যাট্রিক পাশ করতে অন্ততঃ দশ বছর সময় তো লাগে। আর এটা করতে সময় তো লাগবেই। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আর নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে যেতে হবে। তবেই সফলতা আসবে। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	*প্রকাশকাল*
১) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৩) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৪) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৫) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৬) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ১১৫)
ফোন - ৯৩৩০৯৮০৪২৩

২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান

৩) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ৩৪৩৫৫-৬০১২৯

৪) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬